

প্রফুল্ল রায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৬৮ সাল

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন,
কলকাতা-৬।

সুনীল দাশ

স্নেহাস্পদেষু —

শুভক্ষণ

১

ফ্লাইং ক্লাব আর মেয়েদের ইউনিভার্সিটি পেছনে ফেলে ট্যাক্সিটা ডাইনে ঘুরে জুহু-তারা রোডে এসে পড়ল। এখান থেকে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে পাক খেতে খেতে ভিলে পার্লে স্কীমেব দিকে চলে গেছে।

রাস্তার ডান পাশে বিরাট বিরাট হাইরাইজ বিল্ডিং, হোটেল আর বড় বড় কমপাউণ্ডওলা বাংলো। বাঁ ধারে যতদূর চোখ যায় সোনালী বালির বেলা-ভূমি; জুহু বীচ নামে তার জগৎজোড়া খ্যাতি। 'বীচে'র এধারে লাইন দিয়ে হাজার হাজার নারকেল গাছ আকাশে মাথা তুলে আছে। এ গাছ-গুলো যেন পৃথিবীর অহঙ্কার। বীচের ওধার থেকে শুরু হয়েছে সমুদ্র। সীমাহীন অথৈ অ্যারেবিয়ান সী ধু-ধু দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে গেছে।

বীচে অগুনতি শেডের তলায় ভেলপুরি, ইডলি, দোসা আর নারিয়েল পানির (ডাবের জল) দোকান। আর আছে আইসক্রিম পারলার, ছোট ছোট রেস্তোরাঁ ইত্যাদি। প্রচুর বেঁটে বেঁটে পনি আর উটও দেখা যাচ্ছে। এখানে যারা বেড়াতে আসে হর্স বা ক্যামেল রাইডের জন্য জন্তুগুলো ভাড়া করে।

সময়টা মার্চের শেষাশেষি। আরব সাগর এখন বেশ শান্ত। তবে সমুদ্রের দিক থেকে জোর হাওয়া দিয়েছে। উল্টোপাল্টা ঝড়ো বাতাস ভেঙে পড়ছে নারকেল গাছের মাথায়। মাইলের পর মাইল জুড়ে শব্দ উঠছে—সাঁই সাঁই।

বেলা বেশি হয় নি; বড়জোর আটটা সাড়ে আটটা। বীচে লোকজন তেমন নেই। তবে পাখি আছে অজস্র। ঝাঁক ঝাঁক সীগাল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে অলস ডানায় উড়ছে।

ট্যাক্সিটা জুহু-তারা রোডের কয়েকটা বাঁক ঘুরে যেখানে এসে পড়ল সেখান থেকে ভিলে পার্লে স্কীমের নতুন টাউনশিপ খুব দূরে না। এখন বাঁ দিকের

জুহু বীচ ঘন গাছপালা এবং বাড়িটাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

ট্যাক্সির ব্যাকসীটে বসে আছে মধুরা—মধুরা পুনেকর আর গঞ্জালেস।

মধুরার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। খুব কালোও না, আবার ফর্সাও না। তবে তার চেহারায় কচি পাতার সজীবতা মাখানো। সরু কোমর মধুরার। মেদশূন্য শরীরে লম্বাটে ছাঁদ। মসৃণ নিভাঁজ হাত কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। পাতলা ঠোঁট তার, ফুরফুরে নাক। ঘন কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। ডিম্বাকৃতি ভরাট মুখে একটা দাগ পর্যন্ত নেই। মেয়েটির সব আকর্ষণ তার চোখে; এমন কোমল মায়াবী চোখ ক্বচিৎ দেখা যায়।

মধুরার পরনে এই মুহূর্তে একটা ময়ূর-ছাপ দেওয়া কোটা শাড়ি এবং শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ম্যাচ-করা ব্লাউজ। বাঁ হাতে ছোট্টো ঘড়ি, গলায় সরু হার, ডান হাতের মাঝের আঙুলে সবুজ পাথর বসানো একটি আংটি। এই সামান্য সাজেই তাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে।

মধুরার সঙ্গী গঞ্জালেসের বয়স ত্রিশ বত্রিশ। সব দিক থেকেই সে মধুরার উল্টো। মাঝারি হাইটের পেটানো চেহারা। চামড়ার রঙ কালচে বাদামী। ছোট ছোট কটা চোখে হায়নার নজর। চোখের তলার হাড়দুটো বেশ উঁচু, চৌকো চোয়াল, ঝকঝকে ধারাল দাঁত। জাহাজের ক্রুদের মতো ছোট করে ছাঁটা খাড়া খাড়া চুল গঞ্জালেসের। সারা গায়ে অজস্র কাটা দাগ। মারদাঙ্গা করতে গিয়ে সে যত ছুরি খেয়েছে, সারা গায়ে তার স্মৃতিচিহ্ন সাজানো। মজবুত চেহারা, হিংস্র চোখ, চওড়া হাড়—এ সব টের পাইয়ে দেয় লোকটা মারাত্মক টাইপের।

গঞ্জালেস জাতে পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার খ্রীস্টান। এই মুহূর্তে তার পরনে টাইট ট্রাউজার্স আর কলারওলা হাফ শ্লীভস স্পোর্টস গেঞ্জি, কোমরে 007 চওড়া বেল্ট, পায়ে পুরু সোলের শু, বাঁ হাতে ঢাউস ইলেকট্রনিক ঘড়ি, গলায় কালো সুতোয় দস্তার ক্রস ঝুলছে।

ট্যাক্সির ব্যাকসীটে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসেছিল মধুরা। জুহুর সোনালী বেলাভূমি, উড়ন্ত সীগালের ঝাঁক, পনি, উট বা মার্চের উজ্জ্বল রোদ—কোনদিকেই লক্ষ্য নেই তার। গাড়িটা যত ভিলে পার্লে স্কীমের

দিকে এগুচ্ছে ততই হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে অসহ্য কাঁপুনি উঠে এসে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। অদ্ভুত এক ভয় চারপাশ থেকে জালের মতো তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে।

হঠাৎ গঞ্জালেস আস্তে করে ডাকে, 'এই—'

চমকে মুখ ফেরাল মধুরা। এক পলক তাকে লক্ষ্য করে গঞ্জালেস বলল, 'এ কি, তোমাকে এত নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন ? নার্ভগুলো স্টেডি কর।'

মধুরা হাসতে চেষ্টা করল। বলল, 'আমার নার্ভ স্টেডিই আছে।'

ট্যাক্সিটা একটা ক্রসিং-এর মুখে এসে গিয়েছিল। ড্রাইভারকে ডাইনে টার্ন নিতে বলে গঞ্জালেস মধুরার দিকে তাকাল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি ; এক মিনিটের ভেতর বাড়িটার কাছে পৌঁছে যাব। তোমাকে যা যা বলা হয়েছে, মনে আছে ?'

মধুরা মাথা নাড়ল—আছে।

'যেভাবে ছক করে দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবে প্রসীড করবে।'

'আচ্ছা।'

'যেখানে যাচ্ছ সে বাড়ির প্ল্যানটা নিয়ে এসেছ তো ?'

'হ্যাঁ।'

'সার্টিফিকেটগুলো ?'

'হ্যাঁ।' বলেই নিজের কোলের ওপর রাখা বড় লেডীজ ব্যাগটা খুলে দ্রুত কিছু কাগজপত্র দেখে নিল মধুরা। তারপর ব্যাগটা বন্ধ করতে করতে বলল, 'সব আছে।'

গঞ্জালেস বলল, 'পরে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা বা আর যা যা দরকার সব দেওয়া হবে।'

'আচ্ছা'—

'রোজ জুহু বীচে, 'হলিডে ইন' হোটেলের নীচে বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টার ভেতর মহেশ একবার করে আসবে। জরুরী কোন ডিরেকসান থাকলে ওর কাছেই জানতে পারবে। তোমার কোন খবর থাকলে ওকে বলে দিও।'

'ঠিক আছে।'

'এখন কিছুদিন তোমাকে ফোন করা হবে না। বাই চান্স অন্য কেউ লাইন ধরলে সব গড়বড় হয়ে যাবে।'

এ সব কথা নতুন শুনছে না মধুরা। আগেও এ ব্যাপারে স্বয়ং গোকুলদাস আমবানি তাকে বেশ কয়েকবার তালিম দিয়েছে। সে বলল, 'জানি।'

ট্যাক্সিটা এর মধ্যে আরেকটা ক্রসিং-য়ের কাছে এসে পড়েছিল। গঞ্জালেস ব্যস্তভাবে ড্রাইভারকে বলল, 'হিয়াঁ রুখনা'—ট্যাক্সিটা থামলে মধুরাকে বলল, 'এখানে নেমে যাও। ঐ যে বাড়িটা দেখছ, ওখানে তোমাকে যেতে হবে।' প্রায় দু-আড়াই শো গজ দূরে একটা বিরাট বাংলো দেখিয়ে দিল সে।

মধুরা লেডীজ ব্যাগটা নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল।

গঞ্জালেস বলল, 'আমি এবার ফিরব। বেস্ট অফ লাক।'

'ধন্যবাদ' বলতে গিয়ে মধুরা টের পেল, গলার স্বরটা ভীষণ কেঁপে গেছে। গঞ্জালেস আর অপেক্ষা করল না; ট্যাক্সির মুখ ঘুরিয়ে জুহু বীচের দিকে চলে গেল।

২

গঞ্জালেসের ট্যাক্সিটা 'হলিডে ইন' হোটেলের ওদিকে ঘন গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল মধুরা। তারপর আস্তে আস্তে বাংলোটার দিকে এগিয়ে গেল।

এতক্ষণ তবু গঞ্জালেস সঙ্গে ছিল ; এখন মধুরা একেবারে একা। হৃৎপিণ্ডের সেই কাঁপুনিটা হঠাৎ যেন দশ গুণ বেড়ে গেল। একবার সে ভাবল, বাংলোটায় যাবে না। সোজা পার্লা স্টেশনে গিয়ে মাহিমে তাদের সেই 'চাওলে' ফিরে যাবে। পরক্ষণেই মনে হল, তা আর সম্ভব না। গোকুলদাস আমবানির লোকেরা চারদিক থেকে তার ওপব নজর রাখছে। তাদের চোখ এড়িয়ে পৃথিবীর কোথাও পালাবার উপায় নেই।

বোম্বাইয়ের আউটস্কার্টে ভিলে পার্লে স্কীমের এই টাউনশিপটা ছবির মতো। চারদিকে বিরাট বিরাট কমপাউণ্ডওলা মডার্ন আর্কিটেকচারের বাড়িগুলো দেখলে টের পাওয়া যায়, এখানকার বাসিন্দারা আর্থিক কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটির ওপরের দিকের মানুষ ছাড়া এখানে বাড়ি করার কথা কেউ ভাবতেও পারে না।

অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে হাঁটতে কখন যে মধুরা সেই বাড়িটার সামনে চলে এসেছিল, খেয়াল নেই। উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। দেয়ালে আগাগোড়া নানা আকারের রঙীন পাথরের টুকরো বসিয়ে কোলা-জের কাজ।

সুদৃশ্য গেটের একপাশে দেওয়ালের গায়ে পেতলের প্লেটে লেখা আছে : মেরিগোল্ড। বাড়িটার নাম তা-ই। গেটের আরেক পাশে নক্সাকরা শেডের তলায় টুলে বসে আছে নেপালী দরোয়ান। তার গায়ে ঝকঝকে সাদা উর্দি, মাথায় টুপি, কাঁধে রাইফেল।

মধুরাকে দেখে অ্যাটেনশানের ভঙ্গীতে দরোয়ান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপ ?'

মধুরা তার নাম জানিয়ে বলল, 'আজ আমার একটা ইন্টারভিউ আছে।' দরোয়ান পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে কী দেখে নিল। মধুরারও চোখে পড়েছে, কাগজটায় ইংরেজিতে ক'টা নাম লেখা রয়েছে। এই তালিকায় তার নামটাও দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব আজকের ইন্টারভিউতে এদেরও ডাকা হয়েছে।

দরোয়ান কাগজের টুকরোটা পকেটে রেখে গেট খুলে দিল। বলল, 'আইয়ে—'

ভেতরে ঢুকেই একধারে সবুজ কার্পেটের মতো চমৎকার 'লন'। 'লন'টার চারপাশ ঘিরে নানারকম দুষ্প্রাপ্য অর্কিড। আরেক ধারে গোলাপের বাগান। মাঝখান দিয়ে নুড়ির রাস্তা সোজা বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে লাল-নীল গার্ডেন আমব্রেলার তলায় বেতের ফ্যাশনেবল চেয়ার সাজানো রয়েছে।

দরোয়ান নুড়ির রাস্তাটা দেখিয়ে বলল, 'সিধা চলা যাইয়ে—'

লনে গ্র্যাস মোয়ার চালিয়ে একটা লোক ঘাস সমান করছে। আরেকটা লোক পাইপ দিয়ে অর্কিডে আর ঘাসে জল ছিটোচ্ছে। একটা মালী বড় কাঁচি দিয়ে গোলাপ গাছের বুড়ো পাতা ছেঁটে দিচ্ছে। দূরমনস্কর মতো এসব দেখতে দেখতে নুড়ির রাস্তা ধরে বাড়ির সামনে এসে পড়ল।

বাংলো টাইপের এই বাড়িটা তেতলা। অনেকটা সিঁড়ির স্টেপের মতো। একতলাটা সামনের দিকে অনেকখানি বাড়ানো, দোতলাটা খানিকটা পেছন দিকে, তেতলা আরো পেছনে। একতলা দোতলা এবং তেতলার ছাদে রুফ গার্ডেন।

দশটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই কাঁচ দিয়ে বানানো আট পাল্লার বিশাল দরজা। তারপর কম করে এক হাজার স্কোয়ার ফুটের ড্রইং রুম।

এ বাড়িতে আগে আর কখনও আসে নি মধুরা। তবু এখানে কোন্ ফ্লোরে ক'টা বেড রুম, ক'টা টয়লেট, ক'টা কিচেন, ক'টা ডাইনিং রুম, ক'টা লিভিং রুম, কোথায় লাউঞ্জ, ব্যালকনি, কোথায় সুইমিং পুল—সব তার মুখস্থ। বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে কী ভাবে যেন এ বাড়ির

প্ল্যানের একটা ব্লু-প্রিন্ট বার করে এনেছিল গোকুলদাস আমবানি। টেবলে পিন দিয়ে সেটা আটকে কোথায় কী আছে কম করে দশ দিন তাকে দেখিয়ে দিয়েছে। পুরো প্ল্যানটা মধুরার মাথার বসিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত গোকুলদাস তাকে ছাড়ে নি।

সিঁড়ি দিয়ে মধুরা ওপরে উঠতেই একটা বেয়ারা দৌড়ে এল। বলল, 'আপ ইন্টারভিউকা লিয়ে আয়া?'

'হ্যাঁ—' মধুরা মাথা নাড়ল।

বেয়ারা আর কিছু জিজ্ঞেস না করে তাকে ড্রইং রুমের ভেতরে নিয়ে গেল। আরো কয়েকটি মেয়ে সেখানে বসে আছে।

বেয়ারা বলল, 'বৈঠিয়ে হিয়াঁ। আভি ইন্টারভিউ স্টার্ট হো যায়েগা।' বলে দরজার কাছে চলে গেল।

মধুরা একটা সোফায় বসে পড়ল। অন্য মেয়েগুলো কৌতূহলী চোখে তাকে লক্ষ্য করছিল। একটু হেসে মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারাও কি ইন্টার-ভিউ দিতে এসেছেন?'

ঘাড় হেলিয়ে সবাই প্রায় সমস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

'কতক্ষণ ওয়েট করছেন?'

কেউ জানালো আধ ঘণ্টা আগে এসেছে, কেউ পনের মিনিট আগে, কেউ বা দশ মিনিট।

মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'ইন্টারভিউ তো সাড়ে ন'টায় শুরু হবার কথা।'

'হ্যাঁ। ইন্টারভিউ লেটারে সে রমকই সময় দেওয়া আছে।'

'সময়মতো কাজ কি হয়?'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে ড্রইং রুমের এক কোণে একটা মিউজিক্যাল ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বেয়ারাটা কোত্থেকে দৌড়ে এল। বলল, 'স্টারলা বেঞ্জামিন কৌন হ্যায়?'

মাংসল চেহারার একটি মেয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পুরু ঠোঁট, বাদামী রঙ, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা লালচে চুল, পরনে ম্যাক্সি, পায়ে ছ ইঞ্চি ছুঁচলো হীলের জুতো। বলল, 'আমি—'

'আসুন আমার সঙ্গে। বড়া মেমসাব আপনাকে ডেকেছেন।'

স্টারলা বেঞ্জামিনকে নিয়ে বেয়ারাটা ড্রইং রুমের শেষ প্রান্তে চলে গেল। মধুরা আগে লক্ষ্য করে নি। ওখানে একটা অটোমেটিক লিফট রয়েছে। দুজনে লিফটে ঢুকে মুহূর্তে অদৃশ্য হল।

সবসুদ্ধ ছ'জনকে ইন্টারভিউতে ডাকা হয়েছে। কাজটা পাবে মাত্র এক-জন। স্টারলা এখন নেই। তাকে বাদ দিয়ে বাকী যে মেয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে দুজন রীতিমতো স্মার্ট, দেখতেও দারুণ। কাজেই তুড়ি মেরে কাজটা পাওয়া সম্ভব না। কম্পিটিশনটা বেশ ভালই হবে, মনে হচ্ছে।

অবশ্য গোকুলদাস আমবানি ভয়ানক তুখোড় লোক। মধুরার জন্য ক্যাল-কাটা দিল্লী আর ম্যাড্রাসের নাম-করা ক'টা নার্সিং হোম আর বিগ বিজনেস-ম্যানদের ক'টা সার্টিফিকেট যোগাড় করে সঙ্গে দিয়েছে। সে জানে ওগুলো জাল। অন্য মেয়েরা তার মতো জোরালো সার্টিফিকেট জুটিয়ে আনতে পেরেছে কিনা, জানা নেই। প্রচণ্ড টেনশন নিয়ে সে বসে রইল।

টেনশনের কারণও আছে। গোকুলদাস আমবানি কয়েক হাজার বার তাকে জানিয়ে দিয়েছে, এই কাজটা যেভাবেই হোক মধুরাকে পেতেই হবে। না পেলে গোকুলদাস খুশী হবে না। সেটা আরো মারাত্মক ব্যাপার।

সামনে টেবলের ওপর গোটাকয়েক ম্যাগাজিন সাজানো রয়েছে। একটা তুলে এলোমেলো পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মধুরা ভাবতে লাগল, কাজটা পেলেও কী ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়তে হবে, কে জানে।

একসময় দেখা গেল, লিফট থেকে নেমে স্টারলা আর সেই বেয়ারাটা এদিকে আসছে।

মধুরা বলল, 'ইন্টারভিউ কেমন হল?' তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটে বেরিয়েছে।

স্টারলা খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'ঐ একরকম। তবে আমার এ কাজ পোষাবে না। কম্পিটিশন থেকে আমি সরে যাচ্ছি। ট্রাই ইওর লাক।'

'মেরিগোল্ড' থেকে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে জানানো হয়েছিল, এক-

জন পঙ্গু শয্যাশায়ী লোককে সঙ্গ দিতে হবে। সে জন্য কোমল স্বভাবের সহনশীলা সুশ্রী একটি তরুণী প্রয়োজন। তাকে অবশ্যই ট্রেনড নার্স হতে হবে এবং নাম-করা নার্সিং হোম বা হাসপাতালে তার কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। প্রথম শ্রেণীর নার্সিং হোম বা হাসপাতালে দশ বছরের অভিজ্ঞ নার্সকে যা বেতন দেওয়া হয়, এখানে তার দ্বিগুণ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

যাবতীয় শর্ত জেনেই এখানে অ্যাপ্লাই করেছিল স্টারলা। কিন্তু ইন্টারভিউ-তে কী এমন হয়েছে যাতে এই কাজটা সম্পর্কে তার সব আগ্রহ নষ্ট হয়ে গেল! নিজের ভেতরে অসহ্য এক উদ্বেগ টের পেতে লাগল মধুরা।

অন্য একটি মেয়ে স্টারলাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইন্টারভিউতে কী কী জানতে চাইল?'

ড্রইং রুমের দু'ইঞ্চি পুরু কার্পেট মাড়িয়ে বিশাল কাচের দরজাটার দিকে যেতে যেতে স্টারলা উত্তর দিল, 'একটু ওয়েট করুন। আপনাদের টার্ন এল বলে, তখনই জানতে পারবেন।'

এর পর একে একে দীপা ভকিল, সোনিয়া রাই, এলসা গোমস আর ভারতী কৃষ্ণানের ডাক এল। সেই বেয়ারাটাই এক এক করে ওদের নিয়ে যেতে লাগল।

ইন্টারভিউ দেবার পর স্টারলা তবু মুখ খুলেছিল। বাকী চারজন একটি কথাও না বলে চুপচাপ চলে গেল।

সবার পরে এসেছিল বলে মধুরার ডাক এল একেবারে শেষে। বেয়ারার সঙ্গে লিফটের দিকে যেতে যেতে সে অনুভব করল সেই উদ্বেগ এবং ভয়টা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেছে।

দোতলায় উঠে বেয়ারাটা একটা বিশাল ঘরের সামনে নিয়ে এল মধুরাকে। দু'ধারে আগাগোড়া কাচের দেওয়াল। পুরু ইজিপসিয়ান কার্পেট, দামী পর্দা, এয়ারকুলার থেকে শুরু করে যা যা থাকলে একটা ঘর সব চাইতে আরামদায়ক হয়ে ওঠে, এখানে তার সবই আছে।

আগে এখানে না এলেও এই ঘর মধুরার অচেনা নয়। শুধু এই ঘরটাই নয়,

গোটা বাড়ির নক্সাই তো তার মাথায় বসানো রয়েছে। চোখ বেঁধে দিলেও একটা হোঁচট না খেয়ে একতলা থেকে তেতলার ছাদ পর্যন্ত সে ঘুরে আসতে পারবে।

দরজার কাছ থেকে বেয়ারাটা পর্দা সামান্য সরিয়ে বলল, 'মাঈজী, মধুরাজী আ গয়ী—'

ভেতর থেকে স্নিগ্ধ অথচ ভরাট একটি কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'অন্দর আনে বোলো—'

বেয়ারা মধুরাকে বলল, 'যাইয়ে—'

মধুরা ভেতরে পা দিয়েই দেখতে পেল, ঘরের ঠিক মাঝখানে আধখানা বৃত্তের আকারে প্রকাণ্ড গ্ল্যাসটপ সেক্রেটারিয়েট টেবল। তার ওধারে একজন মধ্যবয়সী মহিলা বসে আছেন। টেবলের এধারেও কয়েকটা ফ্যাশনেবল চেয়ার সাজানো। টেবলের ওপর নানা রঙের আট দশটা টেলিফোন, কিছু ফাইল, পেপার ওয়েট, টেবল ক্যালেণ্ডার, পেন হোল্ডার ইত্যাদি।

মধুরা হাতজোড় করে নমস্কার জানালো।

মহিলাটিও দু হাত সামান্য তুলে তাকে বসতে বললেন।

মহিলাকে চিনতে এতটুকু অসুবিধা হল না মধুরার। ইনি প্রতিভাবেন দেশাই। গোকুলদাস আমবানি এঁর ফোটো আগেই দেখিয়েছে তাকে। শুধু এঁরই না; এ বাড়ির সবার ফোটো কম করে পঞ্চাশ বার তাকে দেখতে হয়েছে। বাড়ির প্ল্যানটার মতোই এই সব ফোটো তার মাথায় স্থায়িভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছে গোকুলদাস। সারা জীবনে এগুলো ভোলার আর উপায় নেই।

ফোটোতে ততটা ভাল বোঝা যায় নি। মুখোমুখি বসতেই টের পাওয়া গেল আট ফুট দূরে যিনি বসে আছেন, ফোটোর প্রতিভাবেনের চাইতে তিনি অনেক বেশি সুন্দর। আশ্চর্য অভিজাত, অথচ ভারি কোমল মুখশ্রী। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। এই বয়সেও তাঁর ত্বকে চুলের মতো সরু একটা দাগও পড়ে নি। তবে সামান্য মেদ জমেছে শরীরে। গায়ের রঙ যেন আশ্বিনের সোনালী রৌদ্রঝলক। সিঁথির দুধারে কয়েকটা চুল রুপোর তার হয়ে

গেছে ; বাকীগুলো কুচকুচে কালো। সরু একটি সোনার হার, হীরের নাক-ছাবি, হীরের ইয়ারিং আর পান্নার একটি আংটি ছাড়া তাঁর গায়ে আর কোন গয়না নেই। অথচ মধুরা জানে, ইচ্ছা করলে চুল থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত তিনি হীরে দিয়ে মুড়ে রাখতে পারেন।

সামান্য সাজেই তাঁকে অপার্থিব মনে হচ্ছে। তবু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতেই মধুরার চোখে পড়ল, প্রতিভাবেনের পানপাতার মতো ভরাট মুখে কোথায় একটা বিষাদ মিশে আছে।

প্রতিভাবেনও মধুরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'আমার চেয়ে তুমি অনেক ছোট। তুমি করে বললাম বল্লে কিছু মনে করলে ?'

প্রথম থেকেই মহিলার সহজ আন্তরিক ব্যবহারে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল মধুরা। বলল, 'না, না। আপনি করে বললে আমার খুব অস্বস্তি হবে।'

সস্নেহে হেসে প্রতিভাবেন বললেন, 'গুড গার্ল। এখন কাজের কথায় আসা যাক : এখানে তোমাকে কী করতে হবে, নিশ্চয়ই জানা আছে।'

'খবরের কাগজে আপনাদের বিজ্ঞাপনে যেটুকু লেখা ছিল ঠিক ততটুকই জানি। একজন বেড-রিডন রুগীকে সঙ্গ দিতে হবে।'

'হ্যাঁ। ঐটুকুই সব না। আরো কিছু বক্তব্য আছে।'

'বলুন' একই সঙ্গে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রতিভাবেনের দিকে তাকাল মধুরা।

প্রতিভাবেন বললেন, 'আমাদের প্রথম শর্ত দিনরাত তোমাকে এ বাড়িতে রুগীর কাছাকাছি থাকতে হবে। রাজী ?'

এই উদ্দেশ্যেই তো মধুরার মেরিগোল্ডে আসা। কিন্তু প্রথমেই বেশি উৎসাহ দেখালে প্রতিভাবেনের সন্দেহ হতে পারে। তাই নিরুৎসুক মুখে সে বলল, 'রাজী। তবে—'

'তবে কী ?'

'মাঝে মাঝে মাকে আর ভাইবোনদের দেখতে যেতে পারব তো ?'

'তোমার মা কোথায় থাকেন ?'

'মাহিমে।'

একটু ভেবে প্রতিভাবেন বললেন, 'কাছেই। কিন্তু বেশি যেতে পারবে না। মাসে একদিন ছুটি পেতে পার। যেদিন যাবে, তার পরদিনই কিন্তু ফিরে আসতে হবে।'

মধুরা বলল, 'তাই আসব।'

'এটা কিন্তু শুধু মুখের কথা নয়। স্ট্রিক্টলি মেনে চলতে হবে।'

'মেনে চলব।'

'গুড। এবার দ্বিতীয় শর্ত। তার আগে দু-একটা কথা বলে নিচ্ছি। যে পেশেণ্টকে তোমার সঙ্গ দিতে হবে সে আমার একমাত্র ছেলে। বয়স সাতাশ আঠাশ বছর। বারো বছর বয়স থেকে সে বিছানায় শুয়ে আছে। এমনিতে শরীরের ওপর দিকটা বেশ সুস্থ কিন্তু নীচের অংশটা নিয়েই যত ট্রাবল।'

উন্মুখ হয়ে শুনে যাচ্ছিল মধুরা। বলল, 'কী হয়েছে নীচের দিকে?'

প্রতিভাবেন বললেন, 'প্যারালিসিস। তবে ওখানে সেনসেশনটা ঠিকই আছে! ঠাণ্ডা গরম বুঝতে পারে। বম্বের সব বড় ডাক্তার দিয়ে ট্রিটমেণ্ট করেছি। কিছু হয় নি। আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'ইচ্ছা বা চেষ্টা করলে অনেক আগেই ও উঠে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সেরকম ইচ্ছাই ওর নেই। বলতে পার, মনের জোরটাই ওর পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে।'

মধুরা এসব কথা গোকুলদাস আমবানির মুখে অনেক বার শুনেছে। প্রতিভাবেনের এই পঙ্গু ছেলেটি তার কাছে ছাড়পত্র। তারই সুবাদে এ বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে সে। এখন যেভাবেই হোক, যতদিন না গোকুলদাসের ছক অনুযায়ী কাজটা শেষ করতে পারছে, এখানে তাকে থাকতেই হবে। মধুরা বলল, 'এই মনের জোরটা কি ফিরিয়ে আনা যায় না।'

প্রতিভাবেন বললেন, 'আমরা পারি নি। যে ওর দায়িত্ব নেবে তাকে এই কাজটা করতে হবে। সারাক্ষণ কাছাকাছি থেকে সাহস দিয়ে দিয়ে ওর মানসিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে। কাজটা খুবই কঠিন।'

মধুরা বলল, 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব ম্যাডাম। আপনার ছেলে পনের ষোল বছর বেড-রিডন হয়ে আছেন। তাঁকে দাঁড় করাতে পারব কিনা এক্ষুনি বলতে পারছি না। তবে এটুকু বিশ্বাস করতে পারেন, আমার আন্তরিকতায় কোনরকম ত্রুটি হবে না।'

একটু চুপ করে থেকে প্রতিভাবেন বললেন, 'তোমাকে দেখে তোমার ওপর ভরসা করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আরো দু-একটা কথা বলবার আছে।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মধুরা।

প্রতিভাবেন বলতে লাগলেন, 'অনেক দিন বিছানায় পড়ে থেকে থেকে আমার ছেলেটা খুব খিটখিটে হয়ে গেছে।'

মধুরা বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক।'

'রেগে গেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না। হয়ত গালাগাল দিয়ে বসল। ফলে যে ওর দায়িত্ব নেবে সে ইনসাল্টেড ফীল করতে পারে।'

মধুরা হাসল, 'অসুস্থ মানুষের কথায় যদি অপমানিত বোধ করি তা হলে তো আমি নার্স হবার উপযুক্তই না। নার্সদের একটা বড় কোয়ালিটি হল পেসেন্স—সহ্যশক্তি।'

প্রতিভাবেন বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে বেশ ভাল লাগছে। এবার আরেকটা ফর্মালিটি সেরে নিই। তোমার সার্টিফিকেটগুলো সঙ্গে এনেছ?'

মধুরা মাথা নাড়ল—এনেছে।

প্রতিভাবেন বললেন, 'কিছু মনে করো না, ওগুলো একটু দেখতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।' ব্যস্তভাবে হ্যাণ্ড ব্যাগটা থেকে একটা সাদা বড় এনভেলাপ বার করল মধুরা। ওটার ভেতর তাড়া তাড়া সার্টিফিকেট রয়েছে। সেগুলো প্রতিভাবেনের হাতে দিতে দিতে টের পেল নিজের হাতটা ভীষণ কাঁপছে। এতক্ষণ প্রতিভাবেনের আন্তরিক ব্যবহারে আবহাওয়াটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে মধুরা বুঝতে পারল, সেই পুরনো ভয়টা আবার তার হৃৎপিণ্ডের তলায় ফিরে এসেছে।

প্রতিভাবেন খাম থেকে সার্টিফিকেটগুলো বার করে দেখতে দেখতে বললেন, 'তুমি তো অনেক বড় বড় জায়গায় কাজ করেছ দেখছি। গুড।'

প্রশংসার কথাটাও খুব সম্ভব শুনতে পেল না মধুরা। যদি সার্টিফিকেটগুলো যাচাই করার জন্য নিজের কাছে রেখে দেন প্রতিভাবেন এবং ঐ সব নার্সিং হোম আর হাসপাতালে খোঁজ নেন? উৎকণ্ঠায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে লাগল তার।

প্রতিভাবেন কিন্তু সার্টিফিকেটগুলো রাখলেন না। মধুরাকে ফেরত দিতে দিতে বললেন, 'কবে থেকে তুমি এখানে কাজ করতে পারবে?'

এতক্ষণ দম বন্ধ করে বসে ছিল মধুরা। সার্টিফিকেটগুলো ফেরত পেয়ে আবার স্বাভাবিকভাবে শ্বাস টানতে পারল। যাই হোক, সে বুঝতে পারছে, অন্য ক্যাণ্ডিডেটদের চাইতে তার ইণ্টারভিউ এত বেশি ভাল হয়েছে যে এখনই অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিতে চাইছেন প্রতিভাবেন। এ বাড়িতে যখন তাকে থাকতেই হবে তখন দেরি করার মানে হয় না। মধুরা বলল, 'আপনি যেদিন বলবেন।'

'যদি আজ থেকে করতে বলি?'

'আমার আপত্তি নেই।'

'তুমি কি জামাকাপড়-টাপড় সব নিয়ে এসেছ?'

মধুরা সামান্য হাসল, 'না। আমি যে কাজটা পাব আর আজই যে জয়েন করতে হবে তা তো জানতাম না।'

প্রতিভাবেন হেসে ফেললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। তুমি তো আর অ্যাস্ট্রোলজার নও।'

'আপনি যদি বলেন, আমার জিনিসপত্র নিয়ে বিকেলে আসতে পারি।'

প্রতিভাবেন বললেন, 'এসেই যখন পড়েছ, এখন আর যেতে হবে না। তোমার শাড়িটাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—' হঠাৎ কী মনে করতে থেমে গেলেন। একটু ভেবে ফের বললেন, 'অবশ্য তোমার বাড়িতে খবর দেওয়া দরকার। নইলে সবাই ভাববেন।' বরং এক কাজ করা যাক, একটা গাড়ি দিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দিই। বাড়িতে জানিয়ে তোমার মালপত্র নিয়ে চলে এস।'

মধুরা চমকে উঠল। প্রতিভাবেনরা মাহিমে তাদের 'চাওলে'র ঠিকানা জানুন,

এটা সে একেবারেই চায় না। তার অ্যাপ্লিকেশনে গোকুলদাস নিজের দলের অন্য একজনের অ্যাড্রেস দিয়েছিল। সেখানেই ইন্টারভিউ লেটার গেছে। 'সাত বাংলা' এরিয়াতে ঐ ঠিকানায় পাঁচ বছর চেষ্টা করলেও প্রতি-ভাবেনরা খুঁজে বার করতে পারবেন না। কেননা ঐ নামে এই পৃথিবীতে আর কেউ আছে কিনা, কে জানে। নকল ঠিকানা, নকল সার্টিফিকেটের মতো মধুরা নামটাও নকল। তার আসল নাম অন্য। পুরোপুরি ফলস আইডেনটিটি নিয়ে 'মেরিগোল্ডে' এসে ঢুকেছে সে, যাতে এখান থেকে বেরুলে বম্বের আট মিলিয়ন মানুষের ভেতর থেকে তাকে খুঁজে বার না করা যায়।

মধুরা বলল, 'আমি বাড়ি ফিরব না ম্যাডাম। আপনি যখন দয়া করে আমাকে সিলেক্ট করেছেন, কাজটা এখনই শুরু করে দিতে চাই।'

প্রতিভাবেন ভাবলেন, কাজটা পাছে ফস্কে যায় সেই ভয়ে যেতে চাইছে না মধুরা। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, 'কিন্তু তোমার বাড়ির লোকেরা—'

'তার ব্যবস্থা করছি। আমার এক বন্ধুকে তার অফিসে ফোন করব। সে আমাদের বাড়িতে জানিয়ে দেবে। কাল সকালে কেউ এসে আমার জামা-কাপড় দিয়ে যাবে।'

'বেশ, তাই হবে। আজই তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ।'

'তা হলে তোমার ঘরের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একটু রেস্ট নিয়ে নাও। তারপর কাজ বুঝিয়ে দেব।'

খুবই বিনীত ভঙ্গিতে মধুরা বলল, 'না ম্যাডাম, আমি আগে পেশেন্টকে দেখতে চাই।'

প্রতিভাবেন খুশী হলেন, 'ঠিক আছে। চল তা হলে।' দুজনে উঠে পড়ল।

৩

কয়েক মিনিট পর অটোমেটিক লিফটে করে প্রতিভাবেনের সঙ্গে তেতলায় একটা বিরাট বেডরুমে চলে এল মধুরা। আরাম এবং সুখের জন্য যা যা দরকার তার সবই এখানে মজুদ রয়েছে।

একধারে দেওয়াল জোড়া কাচের জানলার পাশে প্রকাণ্ড খাট। আড়াই ফুট পুরু ফোমের গদির ওপর তিন চারটে বালিশে হেলান দেবার ভঙ্গিতে চিত হয়ে আছে একটি যুবক। চারদিকে নানা ধরনের ম্যাগাজিন এবং বই-টই ছড়ানো। একপাশে ইনফ্রা রে দেবার ল্যাম্প। উঁচু একটা টেবলে অসংখ্য ওষুধের শিশি, ম্যাসাজের টিউব ইত্যাদি। এক পলকেই টের পাওয়া যায়, ওগুলো নার্ভের ওষুধ।

যুবকটির মুখ জানলার দিকে ফেরানো। কাচের বাইরে তাকালেই বম্বের স্কাইলাইন। দূরে অগুনতি নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে 'হলিডে ইন', 'হরাইজন' আর 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের উঁচু উঁচু মাথা দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে সমুদ্র নজরে আসে না। তবে আরেবিয়ান সী'র মাথায় সু-বিশাল আকাশ আর ঝাঁক ঝাঁক সীগাল চোখে পড়ে।

যুবকটির মুখ জানলার দিকে ফেরানো। তবু বোঝা যায় তার চেহারায় প্রতিভাবেনের আদলটা কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন। মুখের গড়ন, গাল, থুতনি বা কপাল—সব কিছুতেই মায়ের ছাপটা বড় বেশি স্পষ্ট। তার পরনে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি আর পাজামা। একটু লক্ষ্য করতেই মধুরা টের পেল, যুবকটির কোমরের তলার দিকটা একেবারে নিশ্চল। কিন্তু ওপর দিকটা রীতিমত সুস্থ এবং সবল।

প্রতিভাবেন খুব নরম গলায় ডাকলেন, 'সোমেশ—'

জানলার দিক থেকে মুখ ফেরাল সোমেশ। পরক্ষণেই মধুরাকে দেখে তার ভুরু কুঁচকে যেতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে, খুবই বিরক্ত হয়েছে সে। তবে

কিছু বলল না ; তাকিয়েই রইল।

প্রতিভাবেন বললেন, 'ছাখ কাকে নিয়ে এসেছি—'

তীক্ষ্ণ গলায় সন্দিগ্ধ ভঙ্গীতে সোমেশ জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ শী ?'

'বলেছিলাম না, তোর দেখাশোনা করতে একজনকে রাখা হবে। মধুরা সেই জন্যে এসেছে।'

'আমার কাউকে দরকার নেই। আগেও কত লোক রেখেছ! কিছু হয়েছে ? লেট মী ডাই পীসফুলি।'

'এ সব কথা বলতে নেই। মধুরা চমৎকার মেয়ে। ওর সঙ্গে কথা বললে তোর খুব ভাল লাগবে।'

'এই পৃথিবীতে কিছুই আমার ভাল লাগে না। আই রিকোয়ার নোবডি। লেট হার গো'—বলে আবার জানালার দিকে মুখ ফেরাল সোমেশ।

প্রতিভাবেনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ছেলের মেজাজ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আগেই মধুরাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোমেশ যে এরকম আচরণ করবে, তিনি ভাবতে পারেন নি।

বিব্রতভাবে কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন প্রতিভাবেন ; ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিল মধুরা। তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় বলল, 'দয়া করে আপনি অন্য ঘরে যান। আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলি।'

মধুরার মনোভাব বুঝতে পারলেন প্রতিভাবেন। এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'দেখ আলাপ করে।' তারপর দ্বিধান্বিতভাবে বেরিয়ে গেলেন। আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মধুরা।

কিছুক্ষণ পর এধারে ঘাড় ফেরাতেই সোমেশের মুখে সেই পুরনো বিরক্তিটা ফিরে এল। কর্কশ গলায় সে বলল, 'এ কি, মা কোথায় ?'

মধুরা বলল, 'চলে গেছেন।'

'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

সোমেশের চোখ মুখ কপাল কুঁচকে যেতে লাগল। রুক্ষ গলায় সে এবার যা বলল তা এইরকম। পরস্পরকে আগে তারা কখনও দেখে নি ; কোন-

রকমপরিচয়ই নেই। তা হলে অচেনা একটি লোকের সঙ্গে কী কথা থাকতে পারে ?

মধুরা খুব নরম গলায় বলল, 'দয়া করে যদি বলবার সুযোগ দেন—'

কী ভেবে সোমেশ বলল, 'আপনি তো ভীষণ নাছোড়বান্দা টাইপের মেয়ে —ভেরি ভেরি 'ডগেড'।'

মধুরা উত্তর দিল না। সামান্য কয়েক মিনিটে সোমেশকে যেটুকু বুঝতে পেরেছে তাতে মনে হয়েছে ওর মুখের ওপর কথা বলতে নেই। সে চুপ করে রইল।

সোমেশ মধুরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দ্রুত একবার দেখে নিল। তারপর সোজা সীলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা বলার আছে চটপট বলে ফেলুন—'

মধুরা বলল, 'আমরা খুব গরীব।'

'সো হোয়াট ?'

'আপনাদের এখানে কাজটা পেলে আমাদের ফ্যামিলি বাঁচতে পারে।'

সোমেশ বলল, 'আমার মায়ের চ্যারিটেবল ফাণ্ড টাণ্ড গোছের কী একটা আছে। সেখান থেকে অনেকে সাহায্য পায়। আমি মাকে বলে দিচ্ছি, যেন—'

তার কথা শেষ হবার আগেই মধুরা বলে উঠল, 'আমি চ্যারিটির জন্যে এখানে আসি নি। কাজ পেলে রেমুনারেসন নেব। ভিক্ষে নিতে পারব না।' তার গলার স্বর মৃদু অথচ দৃঢ়।

সোমেশের দুই চোখ সীলিং থেকে দ্রুত মধুরার মুখের ওপর এসে স্থির হলো। সে বলল, 'আপনার আত্মসম্মান বোধটা বেশ টনটনে।'

'গরীব হলে আত্মসম্মানের গ্ল্যাণ্ডটা কি কেটে ফেলে দিতে হয়!' বলেই মধুরার মনে হলো এভাবে বলাটা ঠিক হয় নি। ঝোঁকের মাথায় সে খুব সম্ভব গোলমালই করে ফেলল। কিন্তু বন্দুক থেকে যে গুলি বেরিয়ে গেছে, এখন আর তা ফেরাবার উপায় নেই।

সোমেশ বলল, 'বা, ফাইন। আপনি বেশ ভাল কথা বলতে পারেন। শার্প

অ্যাণ্ড পানজেন্ট।'

বিদ্রূপ না রাগ, কোন্ মনোভাব থেকে সোমেশ কথাগুলো বলেছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মধুরা সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল ; কিছু বলল না।

সোমেশ আবার বলল, 'ঠিক আছে, চাকরিটা পেলে আপনার ফ্যামিলির যখন উপকার হবে তখন আমি আর আপত্তি করব না। তবে গোড়াতেই একটা কথা বলে দিই। আপনার আগে লাস্ট পনের ষোল বছরে পঞ্চাশ ষাটটা নার্স আমার দায়িত্ব নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছে। প্রত্যেককেই কেঁদেকেটে 'নাকের জলে চোখের জলে হয়ে' ভাসতে হয়েছে। সেই লিস্টে আপনার নামটাও অ্যাডেড হবে।'

মধুরা উত্তর দিল না।

সোমেশ আবার বলল, 'মা কি আপনাকে বলেছেন, আমি খুব টেমপারা-মেণ্টাল ?'

'হ্যাঁ।' মধুরা মাথা নাড়ল।

'কতটা বলেছেন জানি না। তবে যখন মেজাজ খারাপ থাকে হাত চালিয়ে দিই, সামনে যা থাকে ছুঁড়ে মারি। মার খেয়ে অনেক নার্স পালিয়ে গেছে।' বলতে বলতেই বিছানার কোণ থেকে ফেনক্সের (নাক পরিষ্কার করার ওষুধ) একটা শিশি তুলে নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারল সোমেশ।

মধুরার গোটা শরীরে চোখের পলকে স্বয়ংক্রিয় কিছু একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেন। বিদ্যুৎগতিতে বাঁ দিকে অনেকখানি হেলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। শিশিটা সেই হাতে আটকে গেল।

স্কুল কলেজে পড়বার সময় স্পোর্টসে দারুণ নাম ছিল মধুরার। একশো দুশো চারশো মিটার দৌড়ে আর ক্রিকেটে কত যে কাপ-মেডেল পেয়েছে ! এতদিন পর ফেনক্সের শিশিটা লুফে মধুরার মনে হলো, শরীর এখনও 'ফিট' আছে।

সোমেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল, এবং খুশীও। তারিফের ভঙ্গিতে বলল, 'বাঃ, আপনার রিফ্লেক্স একসেলেণ্ট। ভাল স্পোর্টসওম্যান ছিলেন মনে হয়।'

মধুরা বলল, 'যখন ছাত্রী ছিলাম, একটু আধটু খেলাধূলা করতাম।'

'ভালই হলো, আমার হাত থেকে দরকার মতো নিজেকে প্রোটেক্ট করতে পারবেন। আরেকটা কথা—'

'কী ?'

'ষোল বছর আমি বেড-রিডন হয়ে আছি। এর মধ্যে কম করে কয়েক হাজার ট্যাবলেট খেতে হয়েছে, কয়েক হাজার ইনজেকসন নিয়েছি। ওষুধের নাম শুনলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে যায়। আগে থেকেই বলে রাখছি, আমি কিন্তু ট্যাবলেট ফ্যাবলেট খেতে পারব না।'

মধুরা উত্তর দিল না, সামান্য একটু হাসল।

সোমেশ এবার বলল, 'এখন আপনি যেতে পারেন।'

মধুরা ভাবল, তার কাজের ব্যাপারে সোমেশের যে আর আপত্তি নেই, এই খবরটা প্রতিভাবেনকে জানানো দরকার। তিনি এ নিয়ে নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। বলল, 'এখন যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরই কিন্তু আবার আসব।'

'মানে—'

'আজ থেকেই আমার কাজে জয়েন করার কথা।'

সোমেশ আর কিছু বলল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিভাবেনকে দেখতে পেল না মধুরা। তবে প্যাসেজের শেষ মাথায় ঝকঝকে ইউনিফর্ম-পরা একটা বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। সে প্রায় ছুটতে ছুটতে কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'চলুন, বড় মেমসাব আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বেয়ারাটার বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ। স্মার্ট চেহারা। নাকমুখ কাটা কাটা। বোঝা গেল, প্রতিভাবেন তাকে মধুরার জন্য প্যাসেজে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন।

বেয়ারাটার পিছু পিছু এই ফ্লোরেরই আরেকটি ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল, প্রতিভাবেন বসে আছেন। উদ্বিগ্ন মুখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল

মধুরা ?'

মধুরা হেসে বলল, 'সব ঠিক হয়ে গেছে। উনি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে রাজী হয়েছেন।'

'যাক, আমার একটা দুর্ভাবনা কাটল।' বলে একটু থামলেন প্রতিভাবেন। তারপর যা বললেন তা এইরকম। সোমেশের ঘরের লাগোয়া দক্ষিণ দিকের যে ঘরটা সেটা মধুরাকে দেওয়া হবে। সোমেশের দায়িত্ব নিয়ে এখানে আগে যারা এসেছে তারা ঐ ঘরেই থাকত। অবশ্য মধুরা কতক্ষণ আর নিজের ঘরে থাকতে পারবে, দিনের বেশির ভাগ সময়ই তার কাটবে সোমেশের কাছে।

মধুরা উত্তর দিল না চুপচাপ প্রতিভাবেনের পরবর্তী নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

বেয়ারাটা একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিভাবেন এবার তাকে বললেন, 'নয়া মেমসাহেবকে ওঁর কামরা দেখিয়ে দাও।' মধুরাকে বললেন, 'ওর সঙ্গে যাও। এ বেলাটা রেস্ট নিয়ে ও বেলা থেকে কাজ শুরু করো।'

বেয়ারার সঙ্গে দক্ষিণ দিকের সেই ঘরটায় এসে দেখল, সব কিছু নিখুঁত সাজানো। কার্পেট, খাটে বারো ইঞ্চি পুরু ফোমের গদি, এয়ার কুলার, টিভি, ড্রেসিং টেবল, ডিভান—কী নেই এখানে। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, একটা কুটোও কোথাও নজরে পড়ে না। তবু পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে দ্রুত ড্রেসিং টেবলের ডিম্বাকৃতি আয়নাটা মুছে দিল বেয়ারাটা। ধব-ধবে বিছানাটা আরো টান টান করে দিল। বাথরুম থেকে কাচের জাগ ভর্তি করে জল এনে রাখল। আর এ সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমানে বকর বকর করতে লাগল। কয়েক মিনিটের ভেতরেই টের পাইয়ে দিল, কথাটা সে একটু বেশিই বলে থাকে।

নানা এলোমেলো কথার মধ্যে হঠাৎ বেয়ারাটা বলে উঠল, 'জানেন নয়া মেমসাব, আপনার সঙ্গে আমার খুব মিল আছে।'

এই মুহূর্তে এত বকবকামি ভাল লাগছিল না মধুরার। তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিল না। কিন্তু মিলের কথায় তার কপাল কুঁচকে গেল। বিরক্ত

গলায় বলল, 'তার মানে!'

'আপনিও এখানে নতুন, আমিও নতুন।'

মধুরার কপাল আবার মসৃণ হয়ে গেল। নরম গলায় সে বলল, 'কবে এখানে জয়েন করেছ?'

বেয়ারাটা জানালো, 'এক সপ্তাহ আগে।' একটু থেমে বলল, 'আপনি যেমন ছোট সাবের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। অন্য সব কাজের সঙ্গে আপনার দায়িত্ব পেয়েছি আমি।'

মধুরার কপালে আবার ভাঁজ পড়ল। লোকটার কথার ধরণ মোটেই ভাল লাগছে না তার। ঈষৎ তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'আমার দায়িত্ব!'

'মানে আপনার দেখাশোনার দায়িত্ব। যখন যা দরকার হবে, আমাকে বলবেন। আমি তা হলে এখন যাই। খাটের পাশে কলিং বেল আছে। টিপলেই হাজির হয়ে যাব।'

'আচ্ছা, তোমার নামটা কিন্তু জানা হয় নি।'

'রোমিও।'

'লোকটা কি তার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছে। কিন্তু মুখটুক দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না। মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি কৃশ্চান?'

'না না নয়া মেমসাব। আমরা গাড়োয়ালী হিন্দু।'

'তা হলে তোমার মা-বাবা ঐরকম নাম রেখেছে যে!'

'মা-বাবা তো রাখে নি; আমিই রেখেছি। কার কাছে যেন শুনেছিলাম। শুনেই ভাল লেগে গেল। আসল নাম পাল্টে ওটা রেখে দিলাম। এখন নকলটাই চালু হয়ে গেছে।'

মধুরা চমকে উঠল। সে-ও তো নকল নামেই এ বাড়িতে ঢুকেছে। তবে সে নিজে তার নাম বদলায় নি, বদলে দিয়েছে গোকুলদাস আমবানি। যাই হোক, আর কোন প্রশ্ন করল না মধুরা।

রোমিও আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্জন এই কামরায় চুপচাপ খাণিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর খাটের দিকে চলে গেল মধুরা। হ্যাণ্ডব্যাগটা একপাশে রেখে জুতো খুলে টান টান শুয়ে

পড়ল। সেই সকাল থেকে, সকাল থেকেই বা কেন, বেশ কিছুদিন ধরেই তার নার্ভের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। টেনসনটা কাটার পর এখন বেশ আরাম লাগছে।

কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়ল, সবে তো ফার্স্ট রাউণ্ড শেষ হলো। এর পর ফাইনাল স্টেজে পৌঁছুতে কত রাউণ্ড পেরুতে হবে, কে জানে।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে। মধুরা সেই একইভাবে শুয়ে আছে, আর গোকুলদাসের কথা ভাবছে।

গোকুলদাস বার বার সাবধান করে দিয়েছে, এ বাড়িতে কাজটা পেয়ে গেলে প্রথম দিকে সে যেন এখান থেকে ফোন না করে। বলা যায় না, এ বাড়ির লোকেরা তার ওপর হয়ত নজর রাখবে বা তার ফোনের কথাবার্তা লুকিয়ে শোনার চেষ্টা করবে। 'মেরিগোল্ড'র মালিক অর্থাৎ প্রতিভাবেনের স্বামী ধীরুভাই দেশাই যে টাইপের মানুষ তাতে হুট করে নতুন কোন লোককে বিশ্বাস করবেন বলে মনে হয় না। নিশ্চয়ই মধুরার পেছনে প্রথম প্রথম লোক লাগিয়ে তার প্রতিটি মুভমেণ্ট লক্ষ্য করবেন। কাজেই কোন-রকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। অথচ নিরুপায় হয়ে প্রতিভাবেনকে এক বন্ধুকে ফোন করার কথা বলতে হয়েছে। তাঁর চোখে ধুলো দেবার জন্য এলোমেলো ডায়াল ঘুরিয়ে ফোনের ভান করতে হবে মধুরাকে।

গঞ্জালেস বলে গেছে, জুহু বীচে—'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের তলার দিকটায় রোজ বিকেলে মহেশ একবার করে আসবে। মধুরাকে যেভাবেই হোক, বীচে গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। কিন্তু কীভাবে এখান থেকে বেরুবে সে? এ ব্যাপারে একটা অজুহাত তাকে বার করতেই হবে। যে কারণে এ বাড়িতে তার আসা সেটা পঙ্গু শয্যাশায়ী সোমেশকে বিছানা থেকে খাড়া করানো বা হাঁটানো নয়। মধুরার আসল উদ্দেশ্য হল, ধীরুভাই দেশাইর গতিবিধি এবং অ্যাক্টিভিটির খবর যোগাড় করে মহেশের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মহেশের মারফত সে খবর চলে যাবে গোকুলদাসের কাছে। গোকুলদাস বলে দিয়েছে, তাড়াহুড়োর দরকার নেই। মধুরা দারুণ

ইনটেলিজেণ্ট মেয়ে ; তার ওপর গোকুলদাসের অগাধ বিশ্বাস। যে ছক সে করে দিয়েছে, ধীরেসুস্থে আটঘাট বেঁধে মধুরা যেন সেভাবে এগোয়। একটা স্টেপ ভুল হয়ে গেলে অনিবার্য বিপদ। কিন্তু যার জন্য এ বাড়িতে আসা সেই ধীরুভাইকে এখনও দেখতে পায় নি মধুরা। গোকুলদাস জানিয়েছে, ধীরুভাইয়ের চলাফেরা এবং কাজকর্ম, সবই রহস্যময়। ভিলে পার্লে স্কীমের এই বাড়িতে মাসে দু তিন দিনের বেশি তিনি থাকেন না। বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কাটে মিডল ইস্টের নানা কান্ট্রিতে। ধীরুভাই কোন্ কোন্ দেশে যান, কাদের সঙ্গে তাঁর বেশি মেলামেশা, কোথায় কোথায় তাঁর কাজের নেটওয়ার্ক ছড়ানো, এ সবই জানতে হবে মধুরাকে। কিন্তু কীভাবে?

নানারকম উল্টোপাল্টা ভাবনার মধ্যে মা আর ভাইবোনগুলোর মুখ মনে পড়ছিল। গোকুলদাস অবশ্য লোক দিয়ে তার খবর ওদের জানিয়ে দেবে। মা শুধু জানবে, তার বড় মেয়ে ভাল আছে এবং অফিসের জরুরী কাজে বাইরে গেছে। ফিরতে কিছুদিন দেরি হবে। তবে কোথায় গেছে সে, কী করছে, এ সব ডিটেলে জানানো বারণ। এমন কি মধুরারও এ ব্যাপারে মুখ পুরোপুরি বন্ধ। গোকুলদাসের হুকুম ছাড়া মাকে চিঠি লেখা বা ঘিঞ্জি বস্তির মতো মাহিমের চাওলে যাবার উপায় নেই।

নানা দুর্ভাবনায় মাথার ভেতর সব যখন জট পাকিয়ে যাচ্ছে সেই সময় একটা মেয়ে-গলা শোনা গেল, 'নয়া মেমসাব—'

চমকে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল অল্পবয়সী একটি মেয়ে মাঝারি সাইজের একটা নতুন স্যুটকেশ হাতে করে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। চেহারা এবং পোশাক টোশাক দেখে বোঝা যায়, বাড়ির কাজের মেয়ে।

মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে?'

'হাঁ। বড় মেমসাব এটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।' বলে হাতের স্যুটকেশটা দেখাল মেয়েটি।

'কী আছে এতে?' রীতিমত অবাক হয়েই জানতে চাইল মধুরা।

'আমি জানি না।'

একটু ভেবে মধুরা বলল, 'ঠিক আছে, এখানে নিয়ে এস।'

কাছে এসে খাটের গা ঘেঁষে স্যুটকেশটা নামিয়ে মেয়েটা চলে গেল। সে বেরুতে না বেরুতেই ওটা খুলে ফেলল মধুরা। ভেতরে বারো চোদ্দটা শাড়ি, পেটিকোট আর ব্লাউজ। সবগুলোই নতুন। ব্লাউজগুলো নানা মাপের। কোন্ সাইজেরটা তার গায়ে ফিট করবে, প্রতিভাবেন জানেন না। সেই জন্যই খুব সম্ভব অতরকম জামা পাঠিয়েছেন। ভদ্রমহিলার সব দিকেই নজর আছে। বেশ ভাল লাগল মধুরার। একটা শাড়ি আর একটা ব্লাউজ বার করে স্যুটকেশ বন্ধ করল সে। আপাতত এতেই কাজ চলে যাবে।

এখন স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে নেওয়া দরকার। নতুন শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে সে যখন বাথরুমে যাবে, ঠিক তখনই বাইরে থেকে রোমিওর গলা ভেসে এল, 'আসব নয়া মেমসাব?'

মধুরা বলল, 'এসো।'

রোমিও ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল তার হাতে একটা টেলিফোন আর একটা সাদা খাম রয়েছে। খামটা মধুরার হাতে দিয়ে সে বলল, 'বড়া মেমসাব এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।' তারপর টেলিফোনের প্লাগ লাগিয়ে বলল, 'আপনার বন্ধুকে ফোন করবেন বলেছিলেন। বড়া মেমসাব এখানে টেলিফোন দিয়ে যেতে বললেন।' বলে আর দাঁড়াল না রোমিও; ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রথমে খামটা খুলল মধুরা। ভেতর থেকে টাইপ-করা যে কাগজটা বেরুল সেটা তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ফের সেটা খামের ভেতর পুরে নিজের হ্যাণ্ডব্যাগে রাখল। তারপর সোজা চলে গেল বাথরুমে। কিছুক্ষণ পর স্নান-ট্নান চুকিয়ে বেডরুমে ফিরে আসতেই প্রথমেই চোখ গেল টেলিফোনটার দিকে। একবার সে ভাবল, ফোন করবে না। প্রতিভাবেন জিজ্ঞেস করলে বলবে—করেছে। পরক্ষণেই গোকুলদাসের কথা মনে পড়ল। কেউ তার ওপর নজর রাখছে কিনা, সে জানে না। যদি রেখেই থাকে, ফোন না করলে নিশ্চয়ই প্রতিভাবেনের কানে খবরটা পৌঁছে যাবে। ফোন না করাটা তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারে। কাজেই এলোমেলো ডায়াল করে মধুরা এমন-ভাবে কথা বলতে লাগল যেন লাইনের অন্য প্রান্তে আর কেউ আছে।

নিখুঁত অভিনয়ের পর ফোন নামিয়ে রেখে সবে মধুরা ওধারের ডিভানে গিয়ে বসেছে, রোমিওর গলা আবার শোনা গেল, 'ভেতরে আসব নয়া মেমসাব ?'

মধুরা বলল, 'আসতে পার।'

ঘরে এসে রোমিও জানতে চাইল মধুরার স্নান এবং ফোন করা হয়ে গেছে কিনা। হয়েছে জেনে সে বলল, 'এখন কি আপনাকে চা দেব ?'

খুব বেশি চা খায় না মধুরা। সকালে এক কাপ, বিকেলে এক কাপ। সে বলল, 'না। দরকার নেই।'

'দুপুরে আর রাত্তিরে কখন খান ?'

'ঠিক নেই কিছু।'

একটু ভেবে রোমিও বলল, 'আমি একটা নাগাদ এসে আপনাকে ডাইনিং টেবিলে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

'আপনি কি আর কাউকে ফোন করবেন ?'

'না।'

'তা হলে টেলিফোনটা নিয়ে যাই। দরকার হলে আমাকে বলবেন। আবার এনে লাগিয়ে দেব।'

৪.

কাঁটায় কাঁটায় একটায় রোমিও আরো একবাব এসে মধুবাকে ডাইনিং হলে নিয়ে গেল।

খাবার ঘরটা দোতলায়। সেখানে আসতেই চোখে পড়ল, প্রতিভাবেন বসে আছেন। মধুরার জন্যই অপেক্ষা কবছেন তিনি। বললেন, 'এসো—'

মধুরা প্রতিভাবেনের মুখোমুখি বসতেই দুটো বেয়াবা চটপট খাবার সার্ভ করতে লাগল।

খেতে খেতে মধুরা একটা ব্যাপাব লক্ষ করল, প্রতিভাবেন এবং সে ছাড়া বিশাল ডাইনিং হলে আর কেউ নেই। অবশ্য বেয়ারা টেয়ারাদের কথা বাদ। রোমিও যখন তাকে নিয়ে আসছিল তখন বিদ্যুৎ চমকেব মতো মনে হয়েছিল, হয়ত ডাইনিং হলে ধীরুভাই দেশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কিন্তু না, তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ঘণ্টা চারেক এ বাড়িতে কেটে গেল মধুরার। ইণ্টারভিউ নেবার সময় থেকে এখন পযন্ত প্রতিভাবেনের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে কিন্তু একবাবও তাঁর মুখে ধীরুভাইয়ের নাম শোনে নি।

প্রতিভাবেন বললেন, 'সোমেশ একটু টেমপাবামেণ্টাল হলেও একবাব যদি আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে যায়, দেখবে ওব মতো ছেলে হয় না।'

উত্তর না দিয়ে মধুরা প্রতিভাবেনেব দিকে তাকাল। তিনি বলতে লাগলেন, 'আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিংটা যত তাড়াতাড়ি পাব, করে নেবে।'

মধুরা আস্তে করে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

একটু চুপচাপ। তারপর মধুরাই শুরু করল, 'আপনার ছেলের যে সব ট্রিটমেণ্ট এখন পর্যন্ত হয়েছে তার কাগজপত্র আছে?'

'অবশ্যই। রোজই তিনটে নাগাদ একজন স্পেশালিস্ট আসেন। তিনি ওষুধ ইঞ্জেকসান, ডায়েটের চার্ট করে দিয়েছেন। চার্টটা আর কেস হিস্ট্রি তোমাকে

দেব। ওগুলো ভাল করে দেখে নিও।'

'আচ্ছা—'

খাওয়া দাওয়ার পর নিজের ঘরে এসে সবে বসেছে মধুরা, রোমিও সোমেশের যাবতীয় প্রেসক্রিপসন এবং রোগের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়ে গেল।

৫.

অসুখের হিস্ট্রি এবং প্রেসক্রুপসনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। সোমেশের রোগের মূল কারণ প্রচণ্ড মানসিক 'শক' এবং সেই কারণে মারাত্মক শারীরিক আঘাত। সেই আঘাত থেকে শরীরের তলার দিকটা প্যারালিটিক হয়ে গেছে। তার চাইতেও বড় কথা তার মনের জোর, আত্মবিশ্বাস এবং নার্ভ সিস্টেম একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে।

এ সব কথা মোটামুটি প্রতিভাবেনের কাছে আগেই শুনেছে মধুরা। কিন্তু রোগের ইতিহাসের কোথাও সোমেশের মানসিক 'শকে'র কারণ লেখা নেই। সে সম্পর্কে প্রতিভাবেনও কোনরকম আভাস দেন নি। এ জাতীয় অসুখ সম্বন্ধে মধুরার যেটুকু ধারণা বা জ্ঞান তাতে এই 'মেণ্টাল শকে'র ব্যাপারটা খুবই জরুরী। ওটা আবিষ্কার করে সেইভাবে ট্রিটমেণ্ট করা দরকার। এ নিয়ে সোমেশের ডাক্তারের সঙ্গে সে কথা বলবে।

প্রেসক্রুপসনগুলোতে চোখ বুলোতে দেখা গেল, সেই সব ওষুধ এবং ইঞ্জেকসনের নামই ওখানে লেখা আছে যেগুলো স্নায়ুকে চাঙ্গা করে তোলে। পড়া হয়ে গেলে সব কাগজপত্র খামে পুরে একধারে রেখে দিল মধুরা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বাঁ ধারের দেয়ালের দিকে চলে গেল। ওখানে একটা দরজা রয়েছে। সেটার মাঝখানে গোল কাচ বসানো।

দরজাটার ওপাশে সোমেশের ঘর। কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি মারল মধুরা। সোমেশ ওপাশে মাথা হেলিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

দু-এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল মধুরা। তারপর খুব আস্তে দরজা ঠেলে সোমেশের ঘরে চলে এল। কয়েক ঘণ্টা আগে এলেও এই মুহূর্ত থেকে এ বাড়িতে তার কাজ শুরু হল।

সোমেশের মাথার দিকে যে সুদৃশ্য টেবলটায় ওষুধ টোষুধ সাজানো রয়েছে,

সেটার গায়ে একটা চার্ট ঝুলছে। খানিকক্ষণ আগে প্রতিভাবেনের সঙ্গে যখন এ ঘরে প্রথম এসেছিল, তখনও চার্টটা তার চোখে পড়েছিল। সোমেশকে কখন কী ট্যাবলেট বা ক্যাপস্যুল খাওয়াতে হবে, কখন ইঞ্জেকসান আর ইনফ্রা রে দেবার সময়, নিশ্চয়ই সব ডিটেলে লেখা আছে ওটাতে। প্রতিভাবেন চার্টটার কথা বলতে নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। তিনি ভুললেও সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং নার্স হিসেবে মধুরার ওটা দেখে নেওয়া দরকার। এটা তার ডিউটির মধ্যে পড়ে।

চার্টটা দেখে নিঃশব্দে ডানদিকে চলে গেল মধুরা। ওখানে দেয়ালের ধার ঘেঁষে যে সোফাটা রয়েছে, তাতে বসে পড়ল। এখান থেকে সোমেশের মুখের অনেকটা অংশ দেখা যায়। ঘরে ঢোকার পর সে লক্ষ করেছিল সোমেশ ঘুমোচ্ছে। এখনও তার চোখ বোজা। ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়ছে ; বুকটা তালে তালে উঠছে, নামছে। কিন্তু কোমরের নীচের দিকটা যথারীতি নিশ্চল ; সেখানে জীবনের কোন লক্ষণ নেই।

চার্ট অনুযায়ী এখন সোমেশকে ওষুধ দিতে হবে না। একটা ক্যাপস্যুল দিতে হবে সেই ছ'টায়।

সোমেশের দিক থেকে চোখ সরিয়ে সামনের দেয়ালজোড়া বিশাল কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মধুরা। দূরে স্টিল ফোটোগ্রাফের মতো বম্বের স্কাইলাইন। হোটেল, হাই রাইজ বিল্ডিং হাজার হাজার নারকেল গাছের মাথা। নীলাভ আকাশের ওপর শুধু ভাসমান কিছু সাগরপাখি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে সেই পুরনো ভাবনাটা আবার তার মাথায় ফিরে আসতে লাগল। 'মেরিগোল্ডে' তো ঢুকে পড়েছে, এখন আসল কাজটা কীভাবে শুরু করবে ? ধীরুভাই দেশাইর সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। তিনি বোম্বাইতে আছেন কিনা, কে জানে।

ভাবনাটা বেশিদূর এগুলো না, হঠাৎ সোমেশের গলা কানে এল, 'আপনার ডিউটি তা হলে স্টার্ট হয়ে গেল।'

চমকে সোমেশের দিকে মুখ ফেরাল মধুরা। তার চোখ এখনও বোজা। জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ। আপনার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম বোধহয়।' তার

মুখটা কাচুমাচু দেখাল।

'ঘুমোলাম কখন যে ভাঙাবেন! দিনরাত আমি চোখ বুজে পড়ে থাকি। তবে কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে, কে কী করছে না করছে, সব জানতে পারি। এই দেখুন না, আপনি পাশের ঘর থেকে পা টিপে টিপে আমার ঘরে এলেন, আমার ওষুধ খাওয়ার চার্ট দেখলেন, দেখে ঐ সোফাটায় গিয়ে বসলেন, তারপর জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলেন। চোখ বুঁজে থেকেও সব টের পেলাম।' বলতে বলতে চোখ মেলে তাকাল সোমেশ।

মধুরা কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

সোমেশ এবার বলল, 'আপনার সম্বন্ধে একটা কথা ভাবছিলাম—'

আধফোটা গলায় মধুরা বলল, 'কী কথা?'

'একটা অসুস্থ প্যারালাইজড লোকের কাছে সারাক্ষণ থাকতে থাকতে আপনি টায়ার্ড হয়ে পড়বেন। মেণ্টালি আর ফিজিক্যালি অসুস্থ হয়ে পড়াও অসম্ভব না।'

'কিছু হবে না। এ সব আমার অভ্যাস আছে।'

'তা অবশ্য ঠিক। এটা তো আপনার প্রফেসান—চাকরি। লোকে নার্সিংকে কী প্রফেসান যেন বলে?'

'নোব্‌ল।'

'নোব্‌ল—মহান। আমি বলব জঘন্য কাজ। ক'টা টাকার জন্যে নিজেকে টোটালি ধ্বংস করে দেওয়া—টোটালি মীনিংলেস।'

মধুরা চুপ করে রইল।

আর কিছু না বলে কাচের জানালা দিয়ে এবার বাইরে তাকাল সোমেশ। একটু আগে জুহু বীচের দিকে দু-চারটে সীগাল চোখে পড়ছিল। এখন আকাশ জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক সাগর পাখি উড়ছে। মুগ্ধ চোখে পাখি আর আকাশ দেখতে দেখতে সোমেশ বলল, 'বিউটিফুল! জানেন মিস পুনেকর, এই জানালাটা আমার কাছে একমাত্র রিলিফ। বাইরের ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এটার মধ্য দিয়ে আমার যা কিছু কনট্যাক্ট। ভীষণ ইচ্ছে করে রোজ সমুদ্রের ধারে যাই—'

মধুরা সোজা হয়ে বসল, 'যান না কেন ?'

'কে নিয়ে যাবে বলুন। বাবা চান না, আমি বাড়ি থেকে বেরুই। মা'র শরীর ভাল না। হাই প্রেসার, দুটো ম্যাসিভ অ্যাটাক হয়ে গেছে। তাঁরও বেশি চলাফেরা বারণ। বেয়ারা টেয়ারারা যে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, এটাও তিনি চান না।'

বিদ্যুৎচমকের মতো মধুরার মনে হলো, এই সুযোগটা কাজে লাগানো দরকার। এমনিতে হুট করে রোজ একবার জুহু বীচে যাওয়া সম্ভব না ; নিয়মিত গেলে প্রতিভাবেনদের সন্দেহ হতে পারে। তাই যেভাবেই হোক, সোমেশকে নিয়ে তার বেরুতেই হবে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কোন লাভ নেই। খুব সতর্কভাবে এ ব্যাপারে তাকে এগুতে হবে।

মধুরা বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ডাক্তাররা আপনাকে বাইরে নিয়ে যেতে বলেন নি ? আপনার যে ধরনের অসুখ তাতে সারাক্ষণ ঘরে শুয়ে থাকা কিন্তু ঠিক না।'

সোমেশ জানালো, 'পনের ষোল বছর ধরে যত ডাক্তার তার ট্রিটমেণ্ট করেছেন তাঁরা সবাই এই কথাই বলেছেন। কিন্তু—'

সোমেশের কথা শেষ হবার আগেই প্রতিভাবেন এবং মেদহীন ধারাল চেহারার এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকলেন। হাতে মেডিকেল ব্যাগ দেখে বোঝা গেল তিনি ডাক্তার।

ওঁদের দেখে মধুরা উঠে দাঁড়াল। প্রতিভাবেন তার সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডাক্তার দস্তুর, বম্বের এক নম্বর নিউরোলজিস্ট। কয়েক মাস ধরে সোমেশের ট্রিটমেণ্ট করছেন। রোজ তিনটেয় নিয়মিত এ বাড়িতে এসে সোমেশকে একবার করে দেখে যান।

মধুরার সঙ্গে আলাপ করে ডাক্তার দস্তুর খুশী হলেন। বললেন, 'সিস্টার, তোমার এবং আমার এখন থেকে একটাই লক্ষ্য হবে। সেটা হল পেশেণ্টকে বিছানা থেকে তুলে দাঁড় করানো।'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়ল মধুরা।

'ওর ওষুধ আর ডায়েটের চার্ট দেখেছ ?'

'দেখেছি।'

'সেই মতো আপাতত সব চলবে। ওর সেনসরি নার্ভগুলো ভালই আছে বলে মনে হয়। আমি তো দশ মিনিটের জন্যে আসি; তুমি সারাদিন থাকবে। চেষ্টা করবে, অ্যাকটিভ আর প্যাসিভ মুভমেণ্ট করিয়ে ওর বডির নীচের দিকের লিম্বগুলোকে নর্মাল করে তুলতে।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

ডাক্তার দস্তুর এবার চাদর সরিয়ে সোমেশের শরীরের অংশটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মধুরা আস্তে আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারছে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। ডাক্তার দস্তুর একটু পরেই চলে যাবেন। সুযোগটা এখনই নেওয়া দরকার। সে বলল, 'স্যার, আমার একটা কথা আছে।'

মুখ না তুলে ডাক্তার দস্তুর বললেন, 'বলে ফেল—'

সোমেশকে বাইরে নিয়ে যাবার কথা বলল মধুরা।

ডাক্তার দস্তুর বললেন, 'ছাটস ভেরি ইম্পর্টাণ্ট। আমি তো মিসেস দেশাইকে কতবার বলেছি। দিনরাত মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘরে কনফাইণ্ড হয়ে থাকলে শারীরিক শক্তি তো বটেই, মেণ্টাল স্ট্রেন্থ্‌ও নষ্ট হয়ে যায়।' প্রতিভাবেনের দিকে ফিরে বললেন, 'সোমেশকে বাইরে পাঠান। শুধু হাজার হাজার ট্যাবলেট ক্যাপস্যুল গিলিয়ে কিছু হবে না।'

প্রতিভাবেনের মুখটা ম্লান দেখাল। তিনি বললেন, 'সোমেশের বাবা তো এখন বম্বেতে নেই। উনি ফিরে এলে কথা বলে দেখি।'

বোঝা যাচ্ছে, স্বামীকে ভয় পান প্রতিভাবেন। তাঁর মতামত ছাড়া এ বাড়িতে স্বাধীনভাবে কারো বুঝি কিছু করার উপায় নেই।

'কবে ফিরবেন মিস্টার দেশাই ?'

প্রতিভাবেন বললেন, 'দু-চার দিনের ভেতরেই। ক'দিন আগে ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন।'

মধুরার মনে পড়ে গেল, বিকেলে 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের নীচের দিকের বীচে মহেশ আসবে। কিন্তু আজ আর এখান থেকে কোনভাবেই বেরুনো সম্ভব না।

সোমেশকে পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছিল। আবার কাল আসবেন জানিয়ে ডাক্তার দস্তুর তাঁর মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হঠাৎ মধুরার মনে হলো, বীচে যেতে না পারলেও এ বাড়িতে তার অনেক কাজ আছে। বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নক্সা থেকে সে 'মেরিগোল্ড' সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছে। কিন্তু প্ল্যান থেকে আন্দাজ করা আর নিজের চোখে দেখা অনেক তফাত। সে ঠিক করল, সোমেশকে নিয়ে এ বাড়িতেই সে ঘুরে বেড়াবে এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ঘর, বারান্দা, করিডর, প্যাসেজ আর ব্যালকনি লক্ষ্য করবে। সে প্রতিভাবেনকে বলল, 'বাড়িতে হুইল চেয়ার আছে?'

প্রতিভাবেন বললেন, 'আছে। দরকার?'

আস্তে ঘাড় হেলিয়ে মধুরা বলল, 'যতদিন না মিস্টার দেশাই আসছেন, আমি যদি এ বাড়িতেই পেশেণ্টকে হুইল চেয়ারে ঘুরিয়ে বেড়াই, আপত্তি আছে?'

'না না, আপত্তি কীসের? এ বাড়ির যেখানে ইচ্ছা তুমি যেতে পার।' বলে একটু থামলেন। তারপর বাড়ির বাইরে সোমেশকে না পাঠাবার কৈফিয়ৎ হিসেবেই যেন বললেন, 'আসলে কথাটা কী জানো; সোমেশ আমাদের একমাত্র ছেলে। আমার স্বামী বিজনেসের ব্যাপারে বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে থাকেন। তাঁর ভয়, অসুস্থ ছেলে বাইরে গেলে যদি কোন বিপদ টিপদ ঘটে যায়।'

মধুরা উত্তর দিল না।

প্রতিভাবেন এবার বললেন, 'আমি গিয়ে হুইল চেয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে আর দাঁড়ালেন না।

কয়েক মিনিট পর রোমিও ঠেলতে ঠেলতে একটা ঝকঝকে দামী হুইল

চেয়ার এ ঘরে রেখে চলে গেল। চেয়ারটা পেছনে ইচ্ছামতো অনেকখানি হেলিয়ে দেওয়া যায়। তাতে রুগী চিত হয়ে শুয়েও থাকতে পারে। সেদিক থেকে সোমেশকে নিয়ে ঘোরাঘুরির পক্ষে চেয়ারটা খুবই সুবিধাজনক।

মধুরা ভাবল, আজ তেতলাটা ঘুরে ঘুরে দেখবে সে।

এদিকে চেয়ার দেখে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছিল সোমেশ। বলল, 'আর বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে না। আমাকে হুইল চেয়ারে তুলে একটু ঘুরিয়ে আনুন—'

মধুরার ইচ্ছাটা ঐরকমই। তবে মুখে সে বলল, 'এখনই?'

'হ্যাঁ। এখনই।'

'ঘোরাতে নিয়ে যাব। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'যখন যা বলব লক্ষ্মী ছেলের মতো কিন্তু তা করতে হবে।'

মধুরার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে একটু হাসল সোমেশ। নিষ্পাপ ছেলেমানুষি হাসি। সে বলল, 'বুঝেছি। যখন যা ওষুধ টোষুধ দেবেন, চুপচাপ খেতে হবে তো?'

'রাইট।' মধুরাও হেসে ফেলল।

'বেশ রাজী।'

মধুরা এবার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমার কাঁধে ভর দিন।'

সোমেশ মধুরার দুই কাঁধে দুই হাত রেখে শরীরের অনেকটা ভার চাপিয়ে দিল। আর মধুরা তার কোমরের নীচের দিকটা ধরে খুব সন্তর্পণে হেলানো চেয়ারে এনে শুইয়ে দিল।

একটু পরে দেখা গেল, চেয়ারটা ঠেলে ঠেলে প্যাসেজের মসৃণ টাইলসের ওপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মধুরা।

মধুরা যেটুকু দেখেছে আর যেটুকু আন্দাজ করেছে তাতে মনে হয়েছে এ বাড়ির সবগুলো ঘরই কার্পেটে মোড়া; তবে সিঁড়ি প্যাসেজ বা ব্যালকনিতে কার্পেট নেই।

প্যাসেজ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁ পাশের একটা ঘরে ঢুকল মধুরা আর

সোমেশ ; সেখান থেকে আরো একটা ঘরে।

খুব আস্তে আস্তে হুইল চেয়ারটা চালাচ্ছে মধুরা। আর প্রতিটি ঘরের দেয়াল সীলিং ফ্লোর থেকে শুরু করে যাবতীয় আসবাব টাসবাব তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য করছে। গোকুলদাস আমবানি বার বার তাকে বলে দিয়েছে 'মেরি-গোল্ডে'র কোন জিনিসই যেন সে বাদ না দেয়, তুচ্ছ না ভাবে। চোখে যা পড়বে তা যেন খুঁটিয়ে দেখে। তালিম অনুযায়ী সমস্ত কিছু দেখে যাচ্ছে সে। কিন্তু ডিসটেম্পার-করা ঝকঝকে দেয়ালে, দামী জয়পুরী কার্পেট, ঝাড়লণ্ঠনে, ওয়ার্ডরোবে বাইরে থেকে এমন কিছুই চোখে পড়ছে না যা সন্দেহজনক।

তেতলায় মোট আটখানা ঘর। ঘুরে ঘুরে সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মধুরার মনে হয়েছে, নীল সানগ্লাস পরা দুটো চোখ যেন পেছন থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কী যেন খেলে গেছে। দ্রুত বারকয়েক ঘাড় ফিরিয়েছে মধুরা কিন্তু কিছুই চোখে পড়ে নি।

কেউ যদি নজর না রাখে, এরকম মনে হবে কেন ? নাকি ভয় এবং দুর্ভাবনা থেকেই এই ব্যাপারটা মাথায় এসেছে—আসলে যার কোন অস্তিত্বই নেই ? মধুরা ভেবে ভেবে থই পায় না।

আটটা ঘর ঘুরতে অনেকটা সময় লেগে গেল মধুরাদের। এদিকে অধৈর্য হয়ে উঠল সোমেশ, 'এটা কী হচ্ছে মিস পুনেকর ! যদি এক ঘর থেকে আরেক ঘরেই ঘুরে বেড়াবেন, তা হলে আমার ঘরটা কী দোষ করল ?'

'ঘর ছাড়া ফাঁকা জায়গা তো এই ফ্লোরে কম। তাই ঘোরাচ্ছিলাম।'

'এবার রুফ গার্ডেন নিয়ে যান।'

তেতলার ঘর-টর এবং ব্যালকনি যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকে দোতলার দীর্ঘ ছাদ। সেখানে বিরাট রুফ গার্ডেন। নানা আকারের টবে অজস্র ফুল আর অর্কিড দিয়ে বাগানটা চমৎকার সাজানো। ফুলটুলের ভেতর স্ল্যাব জমিয়ে মোজেক করে বসবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যাতা-

য়াতের জন্য চওড়া প্যাসেজও রয়েছে।

মধুরা হুইলচেয়ার ঠেলে সেখানে চলে এল।

সোমেশ বলল, 'অনেকক্ষণ আমাকে নিয়ে ঘুরেছেন। নিশ্চয়ই টায়ার্ড লাগছে। এবার একটু বসুন।'

মধুরা বলল, 'না না, টায়ার্ড হই নি।'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল সোমেশ, 'ইডিয়ট, আপনাকে বসতে বলছি। বসুন—'

অগত্যা হুইল চেয়ারটা একপাশে রেখে কাছাকাছি একটা সিমেন্টের সীটে বসে পড়ল মধুরা।

দূরে সেই চেনা দৃশ্য। আকাশ জুড়ে ঝাঁক ঝাঁক পাখি, নারকেল গাছের লাইন, স্কাইস্ক্রেপার আর অজস্র আলো। সোমেশ পলকহীন সেদিকে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

একসময় সোমেশ বলল, 'অনেকদিন পর জেলখানা থেকে বেরুতে পারলাম। আমার ভীষণ ভাল লাগছে।'

মধুরা বুঝতে পারল, কাচের জানলা দিয়ে ঘেরা নিজের সেই ঘরটার কথা বলছে সোমেশ। ওটা তার কাছে জেলখানা। সে জিজ্ঞেস করল, 'এর আগে যারা আপনার দেখাশোনা করত তারা আপনাকে বাইরে আনত না?'

'আনত। তবে ওদের সিনসিয়ারিটি ছিল না। পয়সা পায় তাই এসব করতে হচ্ছে, এমন একটা ভাব ওদের। আমার একেবারেই ভাল লাগত না। দু-একদিন বাইরে আসার পর আর বেরুতাম না।'

মধুরা হাসল, 'আমার যে সিনসিয়ারিটি আছে, কী করে বুঝলেন?'

সোমেশ বলল, 'বোঝা যায়। বেড-রিডন হয়ে পড়ে থাকলেও অনুভব করার শক্তিটা এখনও আমার নষ্ট হয়ে যায় নি।'

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর উঠে দাঁড়াল মধুরা। বলল, 'এবার কিন্তু আমাকে ডিউটি করতে দিতে হবে।'

সোমেশ বলল, 'ডিউটি তো করছেনই। আমাকে বাইরে নিয়ে এসেছেন,

পাশে বসে সঙ্গ দিচ্ছেন, গল্প করছেন—'

'এ ছাড়া আরো কাজ আছে।'

'কী ?'

'ডাক্তার দস্তুর অ্যাকটিভ আর প্যাসিভ মুভমেন্টের কথা বলে গেছেন মনে আছে তো ?'

'আজ ওটা থাক না।'

'নো। আপনার সঙ্গে কিন্তু জেন্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেছে। যা বলব, পারফেক্ট গুড বয়ের মতো তা করতে রাজী হয়েছেন।'

হাল ছেড়ে দেবার মতো ভঙ্গি করে সোমেশ বলল, 'আপনার সঙ্গে আর পারা যাবে না।'

মধুরা এগিয়ে এসে সোমেশের ডান হাঁটুর ওপর আলতো করে একটা হাত রাখল। বলল, 'আমি যে টাচ করেছি, বুঝতে পারছেন ?'

সোমেশ বলল, 'না।'

এবার জোরে চাপ দিল মধুরা। বলল, 'এখন ?'

'না। কিছুই ফীল করছি না।'

হাতটা তুলে মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার মা বলছিলেন আপনার বডির তলার দিকটা গরম বা ঠাণ্ডা বুঝতে পারে।'

সোমেশ বলল, 'খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা হলে একটু একটু পারি।'

'সেনসরি নার্ভগুলো তা হলে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি।'

'ডাক্তাররা তো তাই বলেন।'

একটু ভেবে মধুরা বলল, 'প্লীজ, এবার আপনার ডান পা'টা একটু নাড়াতে চেষ্টা করুন।'

সোমেশ বলল, 'নড়বে না—'

'প্লীজ ট্রাই।'

'আপনার আগে তিন চারশো নার্স আমাকে চেষ্টা করতে বলেছে। কিন্তু কিছুই হয় নি।'

'হয় নি বলে যে হবে না, এমন কথা কে বলতে পারে। মনে জোর আনুন।

দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সোমেশ আর কিছু বলল না। মধুরা লক্ষ্য করল, নিশ্বাস বন্ধ করে প্রাণপণে পা নাড়াবার চেষ্টা করছে সোমেশ। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, গলার শিরাগুলো পাকিয়ে উঠেছে দড়ির মতো। কিন্তু পা একচুলও নড়ছে না।

জোরে শ্বাস ফেলে হতাশ ভঙ্গিতে সোমেশ বলল, 'হল না ম্যাডাম। পনের ষোল বছর শুয়ে থেকে থেকে কোমর আর হাঁটুর সব মেশিনারি অকেজো হয়ে গেছে।'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল মধুরা, হঠাৎ আবছাভাবে মনে হলো নীল সানগ্লাস-পরা সেই চোখদুটো পেছন থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সে। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। বার বার কেন এরকম মনে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা আছে মধুরার। সে শুনেছে মানুষের অবচেতন মনের গোপনস্তরে সর্বক্ষণ নানা ধরনের ব্যাপার চলতে থাকে। এটা কি তারই কোন প্রকাশ ?

সোমেশ তাকে লক্ষ্য করছিল। বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কী হল ? ওভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন কেন ?'

মধুরা আস্তে আস্তে আবার এধারে ফিরল। বলল, 'না, কিছু না। এমনিই,' পরক্ষণে কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি কব্জা উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, 'পাঁচটা বাজে ; এবার কিন্তু আপনার ট্যাবলেট খাবার সময় হয়েছে। ওটা এখানে নিয়ে আসব, না ঘরে গিয়ে খাবেন ?'

'এখানেই আনুন। অনেকদিন পর বাইরে এসেছি। এখন আর ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

রুফ গার্ডেন থেকে সোজা সোমেশের ঘরে চলে এল মধুরা। ট্যাবলেট আর ওয়াটার বটল নিয়ে বেরুতে যাবে, হঠাৎ পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট একটা শব্দ কানে এল। ও ঘরটা তারই।

চমকে উঠল মধুরা। কেউ কি ওখানে ঢুকেছে ? একমুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে, তারপর দৌড়ে মাঝখানের দরজা ঠেলে নিজের ঘরে চলে

গেল। কিন্তু না, কেউ কোথাও নেই। ঘর একেবারে ফাঁকা।

মধুরার মনে হল, শব্দটা ভুলই শুনেছে। সে বেরিয়ে আসতে যাবে, আচমকা চোখে পড়ল বিছানায় তার বড় হ্যাণ্ড ব্যাগটার মুখ খোলা। কিছু কাগজ-পত্র এধারে ওধারে ছড়িয়ে আছে; দু-একটা ব্যাগের ভেতর আধাআধি ঢোকানো।

হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য জমাট বেঁধে গেল মধুরার। এই ব্যাগে তার যাবতীয় জাল সার্টিফিকেট আর মেরিগোল্ডের নক্শা রয়েছে। স্পষ্ট মনে আছে, ঘর থেকে বেরুবার সময় ব্যাগটার মুখ বন্ধ করে রেখে গিয়েছিল। যখন সে সোমেশের হুইল চেয়ার ঠেলে তেতলার প্যাসেজে ব্যালকনিতে বা রুফ গার্ডেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন নির্ঘাত এখানে কেউ এসেছিল। এমন কি একটু আগে সে যখন সোমেশের ওষুধ নিতে আসে, তখনও লোকটা এ-ঘরে ছিল। মধুরা এসে পড়ায় তাড়াহুড়োয় কাগজপত্র ওভাবে ফেলে পালিয়ে গেছে।

যে-ই এসে থাকুক তার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মধুরা দ্রুত একবার সার্টিফিকেটগুলো আর বাড়ির প্ল্যানটা দেখে নিল। সব ঠিক আছে। টাকা-পয়সাও কিছু খোয়া যায় নি।

পয়সা চুরির জন্য যদি অজানা লোকটা এসে থাকে দুশ্চিন্তার ততটা কারণ নেই। কিন্তু সার্টিফিকেট বা বাড়ির নক্শা দেখাটাই যদি উদ্দেশ্য হয় তা হলে? মধুরার কেন যেন মনে হল, তার ঘরে হানা দেবার সেটাই হয়ত একমাত্র উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে কোন অনিবার্য নিয়মে নীল গগলস পরা সেই চোখদুটো সিনেমা স্লাইডের মতো মাথার ভেতর ফুটে উঠল। নিশ্চয়ই কেউ না কেউ সারাক্ষণ তার ওপর নজর রেখে যাচ্ছে।

মধুরা ভাবল, এ বাড়ি তার পক্ষে একেবারেই নিরাপদ নয়। এখানে তাকে ঘিরে অদৃশ্য একটা ফাঁদ যেন পাতা হয়েছে। এই মুহূর্তে মেরিগোল্ড থেকে তার চলে যাওয়া উচিত। পরক্ষণেই মনে পড়ল, গোকুলদাস আমবানির নির্দেশ ছাড়া এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

অজ্ঞাত এক ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল মধুরার। রুদ্ধশ্বাসে অনেকক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকার পর ব্যাগে সব কাগজপত্র পুরে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে রুফ গার্ডেনের দিকে চলে গেল সে। ব্যাগটাকে আর হাতছাড়া করা যাবে না। ফল্‌স্ সার্টিফিকেটগুলোর কাজ হয়ে গেছে। ওগুলো যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, গোকুলদাসের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তবে মেরিগোল্ডের নকশাটা আপাতত দেওয়া যাবে না। কোথায় কীভাবে রাখলে ওটা পুরোপুরি সুরক্ষিত থাকবে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।

৬

বেশ কিছুক্ষণ আগে সন্ধে হয়ে গেছে।

ভিলে পার্লে স্কীমের রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। জুহু বীচে, দূরে স্বামী বিবেকানন্দ রোডে বা আরো দূরে সান্তাক্রুজ এবং খারে—যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু আলো আর আলো। চারপাশের বিশাল বিশাল হাই রাইজ বিল্ডিংগুলোকে এই মুহূর্তে অলৌকিক মনে হচ্ছে।

অন্ধকার নামার আগেই রুফ গার্ডেন থেকে ফিরে এসেছিল মধুরা আর সোমেশ।

এখন সোমেশ তার বিছানায় শুয়ে আছে। পাশে একটা চেয়ারে বসে ক্রাইম স্টোরি পড়ে শোনাচ্ছে মধুরা। সোমেশই তাকে শোনাতে বলেছে।

এই সময় সেই মেয়েটা ঘরে এসে ঢুকল। দুপুরে একে দিয়েই প্রতিভাবেন শাড়িটাড়ি পাঠিয়েছিলেন। ওর নাম যে উষা তখনই জেনে নিয়েছিল মধুরা।

উষা বলল, 'আপনার সঙ্গে একজন মহিলা দেখা করতে এসেছেন।'

অন্য সময় হলে মধুরা লক্ষ্য করত, আগন্তুক সম্পর্কে 'মেয়ে মানুষ' না বলে 'মহিলা' বলল উষা। এ বাড়ির কাজের লোকেরা যোগ্য শব্দ ব্যবহার করে কথা বলতে জানে। হয়ত প্রতিভাবেন আর ধীরুভাই দেশাইর ট্রেনিং। কিন্তু এই মুহূর্তে মধুরা এতই অবাক হয়ে গেছে যে সে কথা মনে পড়ল না।

কে আসতে পারে? গোকুলদাসরা ছাড়া তার এখানে আসার খবর আর তো কেউ জানে না। মধুরা সতর্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম বলেছেন?'

'মালতী ভোঁসলে। বললেন আপনার বন্ধু।'

মালতী ভোঁসলে নামে সত্যিই তার এক বন্ধু ছিল। একসঙ্গে তারা খারের ন্যাশনাল কলেজে পড়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সাত আট বছর কোন যোগাযোগ নেই। সে মেরিগোল্ডের খবর জানল কী করে? তা ছাড়া তার কাছে মালতীর দরকারই বা কী? ভেতরে ভেতরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল মধুরা। তবে বাইরে সেই উদ্বেগ ফুটে উঠতে দিল না। চোখের কোণ দিয়ে সোমেশকে দেখতে দেখতে চোখেমুখে নকল উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বলল, 'মালতী এসেছে! কোথায় সে?'

'নীচে ড্রইং রুমে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

মধুরা সোমেশের দিকে ঘুরে এবার বলল, 'বন্ধুর সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না।'

সোমেশ বলল, 'আপনাকে আর নীচে যেতে হবে না।' ঊষাকে বলল, 'মালতী ভোঁসলেকে ওপরে এঁর ঘরে এনে বসা।'

ভয়ে ভয়ে ঊষা বলল, 'বড় সাহেবের হুকুম, বাইরের কোন লোককে ওপরে আনা যাবে না।'

সোমেশ ধমকে উঠল, 'আমি বলছি নিয়ে আয়। বড় সাহেব কিছু বললে আমাকে জানাস।'

আর কিছু বলতে সাহস হল না ঊষার; চুপচাপ বেরিয়ে গেল। তিন চার মিনিট বাদে ফিরে এসে সে বলল, 'যান, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসুন।'

অসহ্য উদ্বেগ আর কৌতূহল নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে মধুরা দেখল, ডিভানে তারই বয়সী পাতলা চেহারার একটি মেয়ে বসে আছে। নিষ্পাপ সরল মুখ তার, দেখলে ভাল লাগে। তার পাশে একটা দামী নতুন স্যুটকেশ। মেয়েটিকে আগে আর কখনও দেখে নি মধুরা। সে তার কলেজের বন্ধু মালতী ভোঁসলে নয়। যদিও তার মুখে সারল্য মাখানো তবু মধুরার উদ্বেগ হঠাৎ দশগুণ বেড়ে গেল।

মধুরাকে দেখে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। দ্রুত চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল, 'আমি মালতী।'

মধুরা তার দিকে চোখ রেখে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কাছে গিয়ে বসল।

বলল. 'আমি মধুরা।'

'জানি।' ফের বসতে বসতে মালতী বলল, 'আপনার ফোটো আগেই দেখেছি। চিনতে অসুবিধা হয় নি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না।'

আগের মতোই নীচু গলায় মালতী বলল, 'আস্তে কথা বলুন। কেউ শুনতে পাবে।' তারপর একটু ভেবে শুরু করল, 'আমাকে চেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কেউ কাউকে আগে দেখি নি, ন্যাশনাল কলেজে এক-সঙ্গে পড়ি নি।'

সব কেমন যেন জটিল ধাঁধা হয়ে উঠছে। মধুরা বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

গলার স্বর আরো নামিয়ে মালতী বলল, 'আমি আসছি গোকুলদাস আমবানির কাছ থেকে। আমাকে আপনার বন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে।'

মধুরা হকচকিয়ে গেল। তার স্নায়ুগুলো মুহূর্তে টান টান হয়ে উঠল। এটাই সম্ভব। গোকুলদাসের কথা আগেই ভাবা উচিত ছিল তার।

মালতী এবার বলল, 'আমরা বন্ধুর রোলে প্লে করছি। আপনি টাপনি করে বললে কিন্তু নর্মাল মনে হবে না। তুমি করে বলা যাক। আর অসু-বিধা না হলে একটু চা-টা আনালে ভাল হয়। কেন চায়ের কথা বলছি, আশা করি বুঝতে পেরেছ?'

মধুরা ঠিকই বুঝেছে। বন্ধু এসেছে অথচ তাকে চা-টা খাওয়ানো হচ্ছে না বা তাকে দেখে জমিয়ে গল্প কবছে না বা হাসছে না—এ সব স্বাভাবিক নয়। কেউ লক্ষ্য করলে নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে। খুব ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চায়ের ব্যবস্থা এক্ষুনি করছি।'

রোমিওকে ডেকে চা এবং কিছু খাবার টাবার আনতে বলল মধুরা। আজই প্রথম সে এ বাড়িতে এসেছে। গেস্টের জন্য চা-টা আনাতে ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল তার, কিন্তু স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে হলে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

দশ মিনিটের মধ্যে রোমিও চা, কেক এবং নানারকম ভাজিয়া নিয়ে এল। চায়ের সরঞ্জাম এবং প্লেট টেবিলে নামিয়ে তক্ষুনি চলে গেল সে। মধুরা লক্ষ্য করেছে, কাজ হয়ে গেলে এক সেকেণ্ডও এ ঘরে থাকে না রোমিও।

চা তৈরি করে একটা কাপ মালতীকে দিয়ে আরেকটা নিজে নিল মধুরা। গোকুলদাস আমবানি হঠাৎ কেন এই মেয়েটিকে পাঠালেন জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে।

তার মনোভাবটা যেন আন্দাজ করতে পারল মালতী। চায়ে আলতো করে চুমুক দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আজ বিকেলে 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের ওধারের বীচে তোমার যাবার কথা ছিল। মহেশ অনেকক্ষণ তোমার জন্যে ওয়েট করে ফিরে গেছে। মিস্টার আমবানি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন। এখানে এসে তোমার কোন বিপদ টিপদ হলো কিনা বুঝতে পারছিলেন না। তাই আমাকে পাঠালেন।'

মধুরা বলল, 'কোন গোলমাল হয় নি। সব কিছু প্ল্যান অনুযায়ী স্মুদলি হয়ে গেছে। তবে আজ আমার পক্ষে বীচে যাওয়া সম্ভব ছিল না। গোকুলদাসজীকে বলো, কবে বেরুতে পারব বুঝতে পারছি না। বাড়ির মালিক ধীরুভাই দেশাই এখানে নেই। তাঁর পারমিশান ছাড়া তাঁর ছেলে সোমেশকে নিয়ে বীচে যাওয়া যাবে না। তবে মহেশ যেন রোজ বীচে আসে। সুযোগ পেলেই ওখানে চলে যাব।'

'ঠিক আছে, জানিয়ে দেব।' সেই নতুন স্যুটকেশটা দেখিয়ে মালতী এবার বলল, 'গোকুলদাসজী এটা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতে তোমার জামাকাপড় আর কিছু দরকারী জিনিস রয়েছে। আর এই চিঠিটাও দিয়েছেন।' একটা মুখ-আঁটা সাদা খাম ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করল মালতী।

খামটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে মধুরা বলল, 'আমার কাপড়-টাপড় কোথায় পেলেন গোকুলদাসজী?'

'আপনাদের বাড়ি থেকে আনিয়েছেন।'

চিঠিটা খুলতে যাচ্ছিল মধুরা, মালতী বলল, 'এখন থাক, পরে পড়বেন।'

চা খাওয়া হয়ে এসেছিল, মালতী বলল, 'গোকুলদাসজী তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে বলেছেন।'

মধুরা বলল, 'সাবধানেই থাকতে চেষ্টা করছি।'

একটু চুপচাপ। তারপর মালতী বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি, এবার যাব দরকার হলে বন্ধুর রোলে প্লে করতে আবার আমাকে আসতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আচ্ছা—' এটুকু বলে হঠাৎ থেমে গেল মধুরা।

'কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ। গোকুলদাসজীর কাছে কতদিন কাজ করছ ?'

'চার বছর।'

'আমিও তিন বছর কাজ করছি। আশ্চর্য, আমাদের আগে দেখা হয় নি কেন বল তো ?'

'ওঁর কাছে কত লোক কাজ করে, উনি ছাড়া ওয়ার্ল্ডের কেউ জানে না। উনি না চাইলে দলের লোকেদের কারো সঙ্গে কারো কনট্যাক্ট হওয়া সম্ভব না। আসল ব্যাপারটা কী জানো ?'

'কী ?'

'ওঁর ডান হাত কখন কী করে বাঁ হাতও তা টের পায় না।'

মধুরা উত্তর দিল না।

মালতী উঠে পড়ল। বলল, 'আজ যাই।'

তাকে দেখার পর থেকেই একটা কথা বার বার জানতে ইচ্ছা করছিল মধুরার। মালতী চলে গেলে আর হয়ত সে সুযোগ পাওয়া যাবে না। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আসল নাম কি মালতীই ?'

মালতী একটু চমকে উঠল। তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক পলক মধুরার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর হেসে ফেলল, 'এ কথা থাক। তুমি আসল মধুরা কিনা, সে প্রশ্নও কিন্তু আমি করব না।'

মালতীর কথার মধ্যে একটা গোপন সংকেত ছিল ; সেটা বুঝতে পারল মধুরা। সে বলল, 'পৃথিবীতে এত নাম থাকতে তোমার নাম মালতী ভোঁসলে হল কেন ?'

'কারণ গোকুলদাসজীর ঐ নামটা ভীষণ পছন্দ।' বলে মধুরার কানের কাছে, মুখ ফিস ফিস করল মালতী, 'ন্যাশনাল কলেজে মালতী ভোঁসলে বলে একটা মেয়ে তোমার ক্লাসমেট ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'তার নামটাই তিনি আমাকে উপহার দিয়েছেন।'

'উনি মালতীর কথা জানলেন কী করে?'

'যারা তাঁর কাছে কাজ করে তাদের সবার আলাদা আলাদা ডসিয়ার করে রেখেছেন গোকুলদাসজী। আমাদের সবার চোদ্দ পুরুষের নাম ওখানে লেখা আছে। কবে কার সঙ্গে দশ মিনিট কথা বলেছি তার রেকর্ডও ওতে পাওয়া যাবে। এবার নিশ্চয়ই তুমি জিজ্ঞেস করবে মালতী ভোঁসলে নামটা কেন আমাকে উপহার দেওয়া হল?'

ঠিক এই কথাটাই ভেবেছে মধুরা। অবাক হয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

মালতী বলল, 'তার কারণ একটাই। কারো পক্ষেই এ বাড়িতে ঢুকে সরাসরি তোমার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব না। চাকর-টাকরকে দিয়ে খবর পাঠাতে হবে। সবে তুমি এখানে এসেছ; বন্ধুর নাম শুনলে তোমার যা রি-অ্যাকসান হবে, হঠাৎ অন্য অচেনা নাম শুনলে নিশ্চয়ই তা হবে না। এই সব ভেবেই আমাকে তোমার বন্ধুর ভূমিকায় নামতে হয়েছে। আমি কিন্তু আর থাকতে পারব না।'

আর কিছু না বলে লিফটে করে মালতীকে নিয়ে নীচে নেমে গেল মধুরা। তাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার তেতলায় নিজের ঘরে ফিরে এল। সোমেশের কাছে এখনই যাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ সেও ঘর থেকে চলে এসেছে। কিন্তু গোকুলদাস আমবানির চিঠিটা না পড়া পর্যন্ত তার পক্ষে এখন কোথাও যাওয়া সম্ভব না। নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক টেনশন অনুভব করছে সে; সেই সঙ্গে দারুণ উৎকণ্ঠা।

দু'দিকের দরজা ভাল করে বন্ধ করে বুকের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করল মধুরা। ইংরেজিতে টাইপ-করা কয়েকটা লাইন মাত্র রয়েছে সেখানে। নীচে কারো সই টই নেই। তর্জমা করলে চিঠিটা এইরকম দাঁড়ায়:

'মেরিগোল্ড থেকে বিকেলে বেরুতে পার নি দেখে মনে হচ্ছে, ওখানকার কাজটা তুমি পেয়ে গেছ। তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। তাই একটি মেয়েকে তোমার বন্ধু সাজিয়ে সঙ্গে তোমার জামাকাপড় দিয়ে পাঠালাম। খবর পেয়েছি ধীরুভাই দেশাই এখন দুবাইতে রয়েছে। আজ সোমবার। শুক্রবার দুপুরের ফ্লাইটে সে বোম্বাই ফিরবে। তারপর থেকেই তোমার আসল কাজ শুরু হবে। তোমার সুবিধার জন্য আটটা পাওয়ারফুল টেপ রেকর্ডার পাঠিয়ে দিলাম। ওগুলো স্যুটকেশে জামাকাপড়ের তলায় দেখতে পাবে।

যেভাবে ছক করে দেওয়া আছে ঠিক সেইভাবে এগুবে। আপাতত এখানেই শেষ করছি। চিঠিটা পড়েই পুড়িয়ে ফেলবে। স্যুটকেশে একটা দেশলাইও পাবে। হাতের কাছে আগুন টাগুন যদি না পাও সেজন্য এটা পাঠালাম।'

চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে দ্রুত ঘড়ি দেখল মধুরা। সোমেশকে দশ মিনিটের কথা বলে চল্লিশ মিনিট পার করে দিয়েছে। এখন স্যুটকেশ থেকে দেশলাই বার করে পোড়াতে গেলে আরো খানিকটা সময় লাগবে। মধুরা চিঠিটা ফের বুকের ভেতর পুরে সোমেশের ঘরের দিকে যেতে যেতে ভাবল, এখন থাক, রাত্তিরে কোন একসময় বাথরুমে গিয়ে ওটা পুড়িয়ে কমোডে ফেলে ফ্লাশ টেনে দেবে।

সোমেশ কাচের জানলা দিয়ে ভিলে পার্লের আলোকিত স্কাই লাইনের দিকে তাকিয়ে ছিল। মধুরার পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বন্ধুর সঙ্গে গল্প বুঝি আর শেষ হয় না।'

মজা করেই বলেছে সোমেশ তবু অস্বস্তি হতে লাগল মধুরার। সারাক্ষণ সোমেশকে সঙ্গ দেওয়াই তার চাকরি। যদিও এটা তার আসল কাজ না, তবু যতক্ষণ এবাড়িতে আছে সোমেশের কাছে না থাকলে ভাল দেখায় না। আধফোটা গলায় সে বলল, 'অনেকদিন পর বন্ধুর সঙ্গে দেখা ; কিছুতেই ছাড়তে চাইছিল না।' বলতে বলতে সোমেশের ওষুধ খাওয়া এবং ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর্ ডিনার টাইমের যে চার্টটা টাঙানো রয়েছে সোজা

সেদিকে চলে গেল।

চার্ট অনুযায়ী আটটায় ডিনার খেয়ে নিতে হবে সোমেশকে। কী খাবে তা-ও লেখা আছে ওখানে।

এখন সাতটা পঁয়তাল্লিশ। মধুরা সামান্য অস্থির হয়ে উঠল। বলল, 'আমি একটু আসছি—'

'আবার কোথায় যাবেন?'

'আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে আসি। ডিনারের সময় হয়ে এসেছে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। ঠিক সময়ে ডিনার এসে যাবে। আপনি বসুন—'

সুতরাং বসতেই হল। মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'পেরি মেসনের বইটার বাকীটুকু পড়ব?'

'না।' সোমেশ মাথা নাড়ল, 'আপনার বন্ধুর কথা বলুন।'

চমকে উঠল মধুরা। হঠাৎ নকল মালতী সম্পর্কে জানতে চাইছে কেন সোমেশ? তার উদ্দেশ্য কী?

কিন্তু কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলতেই ভয়টা কেটে গেল মধুরার। মালতী সম্পর্কে সোমেশ যা যা প্রশ্ন করল সেগুলো সাধারণ কৌতূহল মাত্র। তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই।

তারপর ওধারের ব্যালকনিতে কোন মিউজিক্যাল ঘড়িতে যখন আটটা বাজল তখন একটা বেয়ারা অ্যালুমিনিয়ামের সুদৃশ্য ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এ ঘরে এসে ঢুকল। গ্লাসটপ ট্রলিটার অনেকগুলো তাক। তাকে ধবধবে তোয়ালের ওপর নানা রকম সুদৃশ্য ক্রকারিতে খাবার সাজানো রয়েছে। ধুলোটুলো যাতে না পড়ে সেজন্য প্রত্যেকটা পাত্রের মুখ ঢাকা।

ট্রলিটা একধারে রেখে বেয়ারা দাঁড়িয়ে রইল। মধুরা বলল, 'তুমি যাও, খাওয়া হয়ে গেলে বেল বাজাব। প্লেট-টেটগুলো নিয়ে যেও।'

বেয়ারা চলে গেল।

মধুরা চটপট প্লেটে খাবার সাজিয়ে, কাচের গেলাসে জল ভরে বলল, 'আমি খাইয়ে দেব?'

সোমেশ বলল, 'আমার নীচের দিকটা প্যারালাইজড হয়ে গেলেও ওপর দিকটা ভালই আছে মিস পুনেকর। খাওয়ার ব্যাপারে আমাকে অন্তত স্বাবলম্বী থাকতে দিন। ট্রলিটা বিছানার কাছে এগিয়ে দিলেই খেতে পারব।'

মধুরা তাই করল।

খেতে খেতে সোমেশ বলল, 'আমি খাচ্ছি আর আপনি বসে আছেন, এটা খুব খারাপ লাগছে।' কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে কী ভেবে ফের বলল, 'মাকে বলব, কাল থেকে আপনি এখানে বসে খাবেন। আপনার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, বিকেলের টিফিন, ডিনার—সব যেন আমার খাবারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয়।'

মধুরা বলল, 'আপনার যেমন ইচ্ছে—'

এরপর এলোমেলো গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করল সোমেশ। মধুরা বেল বাজাতেই সেই বেয়ারাটা এসে এঁটো প্লেট-টে্‌টস্বুদ্ধ ট্রলিটা নিয়ে চলে গেল।

আরো ঘণ্টাখানেক বাদে রোমিও এসে বলল, 'ডিনার দেওয়া হয়েছে। বড় মেমসাহেব আপনার জন্যে ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করছেন।'

মধুরা সোমেশকে জিজ্ঞেস করল, 'যাব?'

'নিশ্চয়ই যাবেন।' সোমেশ প্রায় ধমকে উঠল, 'কী মতলব আপনার—এখানে কাজ করতে এসে হাওয়া খেয়ে থাকবেন? উঠুন, উঠুন—একরকম তাড়া দিয়েই মধুরাকে তুলে দিল সে।

একটু পর ডাইনিং রুমে এসে প্রতিভাবেনের দিকে তাকাতেই মনে হল, কোন কারণে তিনি বেশ খুশী আছেন। খেতে খেতে কারণটা বোঝা গেল।

প্রতিভাবেন বললেন, 'আমি দূর থেকে তোমাকে আর সোমেশকে লক্ষ্য করেছি। মনে হল, সোমেশের তোমাকে পছন্দ হয়েছে। তোমার হাতে ওর দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওকে নিয়ে আমার বড়

দুশ্চিন্তা।'

মধুরা উত্তর দিল না।

প্রতিভাবেন আবার বললেন, 'বিকেলে দেখলাম সোমেশকে নিয়ে তুমি এ ঘরে ও ঘরে আর তেতলার ছাদের বাগানে ঘুরছিলে।'

ঘুরে বেড়াবার প্রসঙ্গটা যখন প্রতিভাবেন তুললেন তখন সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগানো দরকার। মধুরা সেই পুরনো কথাটা আরো একবার নতুন করে বলল, 'এটুকু ঘুরেই পেশেন্টের মন অনেকটা ভাল হয়ে গেছে। বাইরে নিয়ে যেতে পারলে ওঁর উপকার হতো। বীচে যাবার জন্য বার বার বলছিলেন।' বীচের কথাটা একটু বাড়িয়েই বলল মধুরা। সোমেশ ওখানে নিয়ে যেতে বলেছে ঠিকই, তবে বার বার নয়। সে যদি একবারও না বলত, মধুরা তাকে বীচে নিয়ে যাবার জন্য অনবরত চাপ দিয়ে যেত। এবং এই চাপটা সে রেখে যাবে।

প্রতিভাবেন বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, সোমেশের বাবা না ফেরা পর্যন্ত এ বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।'

মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'উনি কবে আসবেন?'

প্রতিভাবেন বললেন, 'আজ সন্ধেবেলা ট্রাঙ্ক কল করেছিলেন। বললেন শুক্রবার দুপুরের ফ্লাইটে আসছেন।'

এ খবরটা আজই চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে গোকুলদাস আমবানি। মধুরা অবাক হয়ে ভাবল, গোকুলদাসের কাজের নেটওয়ার্ক কী সাঙ্ঘাতিক! শিকারী গ্রে হাউণ্ডের মতো একদল লোককে সারা পৃথিবী জুড়ে বোধহয় ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তার সংকেত পাওয়া মাত্র যে কোন খবর তারা বোম্বাইতে পৌঁছে দিচ্ছে। নইলে কবে কোন্ ফ্লাইটে ধীরুভাই আসছেন, তা জানবে কী করে গোকুলদাস?

প্রতিভাবেন বললেন, 'তোমার কি মনে হয়, ছেলেটা উঠে দাঁড়াতে পারবে?'

'সবে তো এলাম। দিন কয়েক দেখি। তারপর বলতে পারব। তবে যাতে দাঁড়াতে পারেন তার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করে যাব।'

খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সোমেশের ঘরে এলো মধুরা, সোমেশ অন্য-মনস্কর মতো পেরি মেসনের সেই বইটার পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

মধুরা খাটের পাশের সেই চেয়ারটায় বসতে যাবে, মুখ তুলে সোমেশ বলল, 'এ কি, বসছেন যে!'

মধুরা হকচকিয়ে গেল, 'না, মানে বইটা তো তখন শেষ করতে পারি নি। পড়ে শোনাতাম।'

'এখন ক্রাইম স্টোরি না শুনলেও আমার চলবে।'

'তবু আমাকে বসবার পারমিসান দিন।'

'হোয়াই ?'

'আপনাকে দিনরাত সঙ্গ দেওয়াটাই আমার চাকরির সব চাইতে বড় শর্ত।'

পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সোমেশ। তারপর রুক্ষ গলায় বলল, 'বডির নীচের দিকটা অকেজো হয়ে গেলেও আমি একটা ইয়াং ম্যান। একজন অনাত্মীয় যুবকের ঘরে রাত্তিরে থাকতে আপনার লজ্জা করবে না।'

মধুরা বলল, 'আমি তো কোন অনাত্মীয় যুবকের ঘরে রাত্তিরে থাকতে চাইছি না।'

থতমত খেয়ে গেল সোমেশ। বলল, 'তা হলে ?'

মধুরা অল্প হেসে বলল, 'আমি থাকব একজন পেসেণ্টের কাছে। একজন নার্সের সেটাই তো সেক্রেড ডিউটি।'

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল সোমেশ, 'সেক্রেড ডিউটি! আপনি আমাকে ভেবেছেন কী—হার্টলেস বীস্ট ? ক'টা টাকার জন্যে সারাদিন একটা পঙ্গু লোকের সঙ্গে কাটাবেন, তারপর রাত্তিরে না ঘুমিয়ে কাছে বসে থাকবেন! আমি এ সব অ্যালাউ করব না। গেট আউট, গেট আউট। এক্ষুনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

মধুরা তবু গেল না। এই মুহূর্তে সিনেমা স্লাইডের মতো সোমেশের একটা

অনাবিষ্কৃত দিক চোখের সামনে যেন ফুটে উঠল। বাইরের কর্কশ খোলার ভেতরে যে একটা নরম হৃদয়বান সহানুভূতিপ্রবণ মানুষ আছে, তা জানতে পেরে বড় ভাল লাগল মধুরার।

সোমেশ এবার চেঁচিয়ে উঠল, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছেন! আমার কথা কানে যাচ্ছে না!' বলেই হাতের বইটা প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়ে মারল।

টুক করে বইটা লুফে নিয়ে মধুরা হেসে হেসে বলল, 'যাচ্ছি। তার আগে এ ঘরের লাইটটা কি নিভিয়ে দেব?'

বইটা টার্গেটে না লাগায় একটু হতাশই যেন হল সোমেশ। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেড সুইচ আছে; আমি নিবিয়ে দিতে পারব। প্লীজ ক্লীয়ার আউট—'

অগত্যা পাশের ঘরে চলে গেল মধুরা। সোমেশ যে তাকে রাতে তার ঘরে থাকতে দেয় নি, তা একরকম ভালই হয়েছে। এখন তার অনেক কাজ।

গোকুলদাস যে সুটকেশটা পাঠিয়েছে, প্রথমে সেটা খুলে জামাকাপড় বার করে ওয়ার্ডরোবে সাজিয়ে রাখলো মধুরা। সেই সঙ্গে দেশলাইটাও বার করেছে। এবার টেপরেকর্ডারগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখল সে। চার ইঞ্চি সাইজের মোট ছ'টা জাপানী মেশিন। সেগুলো আপাতত সুটকেশে চাবি দিয়ে রাখল। তারপর দেশলাই নিয়ে সোজা বাথরুমে চলে গেল। গিয়েই ব্লাউজের ভেতর থেকে গোকুলদাসের চিঠিটা বার করে পুড়িয়ে কমোডে ফেলে দিল। ফ্লাশ টেনে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে ফের বেডরুমে চলে এল মধুরা।

সেই সকাল থেকে একের পরে এক অজস্র ঘটনা এবং মারাত্মক টেনসানের মধ্যে দিনটা কেটেছে। সারাদিনের চটকানো শাড়িটাড়ি বদলে মধুরা শুয়ে পড়ল। তারপর বেড সুইচ টিপে যেই আলো নেভাতে যাবে, কাচের জানলায় নীল গগলস পরা দুটো চোখ পলকের জন্য দেখতে পেল।

আগে কয়েকবারই তার মনে হয়েছে, ঐ চোখ দুটো তার পেছন পেছন ঘুরছে। কিন্তু কখনও স্পষ্ট করে কিছু দেখে নি। মধুরা ভেবেছে, ওটা তার চোখের ভুল। কিন্তু এবার পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে সে।

বুকের ভেতরটা ধক্ করে উঠল মধুরার। লাফ দিয়ে খাট থেকে নীচে নেমে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল সে। প্যাসেজে বা ওধারের ব্যালকনিতে তেজী আলো জ্বলছে। কিন্তু সব ফাঁকা ; কেউ কোথাও নেই।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এসে লাইট নেভাল মধুরা। অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারল না। গাঢ় অন্ধকারেও মনে হচ্ছে, চারদিক থেকে একজোড়া নীল চশমা পরা চোখ তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

৬

মেরিগোল্ডে আসার পর দিন তিনেক কেটে গেছে।

এর মধ্যে সারা দিনের রুটিনটা এইভাবে করে নিয়েছে মধুরা। ভোরে উঠেই মুখ-টুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টে সে চলে যায় সোমেশের ঘরে। তার মুখ ধোয়া হতে না হতে দু'জনের ব্রেকফাস্ট এসে যায়।

সকালের খাবারের সঙ্গে সোমেশকে একটা ট্যাবলেট খাওয়ায় মধুরা। ততক্ষণে মর্নিং এডিসানের তিনখানা খবরের কাগজ এসে যায়। দুটো ইংরাজী, একটা গুজরাতী। নিজে মারাঠী হলেও গুজরাতী ভাষাটা পড়তে এবং লিখতে পারে মধুরা। বেলা ন'টা পর্যন্ত তিনখানা কাগজ পড়ে শোনাতে হয় সোমেশকে। তারপর মিনিট দশেক কোমরের নীচের দিকটা ম্যাসাজ করে দেয়। ম্যাসাজের পর স্নান।

সোমেশকে স্নান করিয়ে নিজের ঘরে চলে আসে মধুরা এবং সোজা বাথরুমে ঢুকে যায়। নিজের স্নানট্নান চুকিয়ে ফের পাশের ঘরে এসে সোমেশের অসাড় প্রত্যঙ্গে অ্যাকটিভ আর প্যাসিভ মুভমেণ্ট করাতে চেষ্টা করে। প্যাসিভ মুভমেণ্ট অর্থাৎ সোমেশের পায়ের আঙুল, ঊরু বা হাঁটু ধরে নাড়াচাড়া করে সে ; শরীরের ঐ সব অবশ অংশগুলিকে সবল স্বাভাবিক করে তুলতে চায়। কিন্তু অ্যাকটিভ মুভমেণ্টটা কিছুতেই হয়ে ওঠে না। মধুরা যত বলে, 'পা দুটো নাড়ান' বা 'উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন', ততই সোমেশ বলে, 'পারব না।' মধুরা বলেছে, 'প্লীজ ট্রাই।' সোমেশ বলেছে, 'ইমপসিবল।' মধুরা বলেছে, 'মনে জোর আনুন।' সোমেশ বলেছে, 'আমার বডির লোয়ার পার্টসগুলোর মতো আমার মেণ্টাল স্ট্রেনথ্ও নষ্ট হয়ে গেছে।' মধুরা বলেছে, 'তা বললে শুনছে কে ? আপনার ব্যাপারটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আপনাকে—' সোমেশ জিজ্ঞেস করেছে, 'আমাকে কী ?' মধুরা বলেছে, 'দাঁড় না করানো পর্যন্ত এ বাড়ি থেকে

আমি যাচ্ছি না।' চোখ কুঁচকে হেসে হেসে সোমেশ বলেছে, 'ফাইন। তা হলে আমাকে আর দাঁড় করাতে চেষ্টা করবেন না।' অবাক হয়ে মধুরা বলেছে, 'তার মানে!' সোমেশ বলেছে, 'আমি উঠে দাঁড়ালেই তো আপনি চলে যাবেন।' মধুরা বলেছে 'ও, আমি যাতে থেকে যাই, সেই জন্যে দাঁড়াতে চাইছেন না!' সোমেশ হেসেছে, কিছু বলে নি।

এ জাতীয় কথাবার্তাই শুধু না, সোমেশের প্যারালিসিসের কারণটাও বার করতে চেষ্টা করেছে মধুরা। সে বলেছে, আপনার মায়ের কাছে শুনেছি, বারো বছর বয়সে একটা অ্যাকসিডেন্ট হবার পর থেকে আপনি বেড-রিডন হয়ে আছেন।' সোমেশ মাথা নেড়ে জানিয়েছে, 'হ্যাঁ। ঠিক তাই।' মধুরা জিজ্ঞেস করেছে, 'কী ধরনের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, কাইণ্ডলি একটু বলবেন।' মধুরা লক্ষ্য করেছে, এই প্রশ্নটা করলেই মুখচোখের চেহারা পাল্টে যায় সোমেশের। রূঢ় গলায় সে বলেছে, 'না, বলব না।' প্রথম দিন সোমেশের এই উত্তর শোনার পর চুপ করে গেছে মধুরা। কিন্তু পরের দু'দিন সে ছাড়ে নি। সোমেশের রূঢ়তা অগ্রাহ্য করে একই প্রশ্ন বার বার করে গেছে। তার ফল হয়েছে, সোমেশ হাতের সামনে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে মেরেছে। খুব সহজেই সেগুলো লুফে নিয়েছে মধুরা আর মনে মনে ভেবেছে, যে ভাবেই হোক সোমেশের দুর্ঘটনাটা বিশদভাবে তাকে জানতে হবে।

যাই হোক, এইরকম নানা কথার মধ্যে দুপুর হয়ে যায়। কাঁটায় কাঁটায় বারোটায়, সূর্য যখন আরব সাগরের ঠিক মাথায়, ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে বেয়ারা লাঞ্চ নিয়ে আসে। এলোমেলো গল্প করতে করতে দু'জনে দুপুরের খাওয়া সেরে ফেলে। লাঞ্চের পর ঘণ্টাদুয়েক চোখ বুজে বিশ্রাম করে সোমেশ, আর পাশে বসে থাকে মধুরা।

দু ঘণ্টা পর সোমেশ চোখ মেললে তাকে একদিন ইঞ্জেকসান, আরেক দিন ইনফ্রা রে দেয় মধুরা। তারপর চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিকেলের চা চলে আসে।

চা খাওয়ার পর এক সেকেণ্ডও আর শুয়ে থাকতে চায় না সোমেশ। তাকে

হুইল চেয়ারে তুলে তেতলা ঘুরিয়ে লিফ্‌ট করে দোতলায় নামে, সেখান থেকে একতলায়।

প্রতিভাবেন বলে দিয়েছেন, সোমেশকে নিয়ে এ বাড়ির যে কোন জায়গায় যখন ইচ্ছা মধুরা যেতে পারে। মেরিগোল্ডের প্ল্যান তার মুখস্থ। কোথায় বেডরুম, কোথায় টয়লেট, কোথায় ড্রইং রুম, সব চোখ বুজে বলে দিতে পারে সে। তবু সোমেশের হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে তীক্ষ্ণ চোখে তেতলা থেকে একতলা পর্যন্ত প্রতিটি ঘরের দেয়াল সীলিং বা মেঝে সে লক্ষ্য করে। গোকুলদাস বার বার এগুলো তাকে খুঁটিয়ে দেখতে বলেছে। গোকুলদাসের ধারণা, মেরিগোল্ডে কোথাও একটা গোপন কুঠুরি বা চেম্বার আছে, সেটা মধুরাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

তিন দিন ধরে গোটা বাড়িটা তোলপাড় করে ফেলেছে মধুরা কিন্তু সন্দেহ-জনক এমন কিছুই কোথাও তার চোখে পড়ে নি যা থেকে গোপন চেম্বারের হদিস পাওয়া যায়।

সারা বাড়ি ঘোরাবার পর সন্ধের আগে আগে আবার তারা সোমেশের ঘরে ফিরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আরেক বার চাও এসে যায়।

চা খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বই-টই পড়ে শোনায় মধুরা। তারপর আরো একবার অ্যাকটিভ এবং প্যাসিভ মুভমেণ্ট করাতে চেষ্টা করে। এ সব করতে করতে ডিনারের সময় হয়ে যায়।

রাতের খাওয়া হয়ে গেলে এক মুহূর্তও আর মধুরাকে নিজের ঘরে থাকতে দেয় না সোমেশ। জোরজার করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

মাত্র তিন দিনেই মধুরা বুঝতে পেরেছে, যে দৈনন্দিন রুটিনটা সে করেছে তাতেই দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সোমেশ। তার ধারণা, এক সপ্তাহ এভাবে চললে সে পুরোপুরি তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

রাত্তিরে মধুরা পাশের ঘরে চলে গেলে কী হবে, বেশ কয়েক বার উঠে এসে সোমেশকে দেখে যায়। ঘুমের ঘোরে মাথাটা হয়ত বালিশ থেকে নেমে গেছে। মাথাটা তুলে দেয় সে। গায়ের চাদরটা সরে গেলে ঠিক করে ঢেকে দিয়ে যায়। এই অসহায় হৃদয়বান, হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে-ওঠা ছেলেটাকে

তারও ভাল লাগতে শুরু করেছে।
এই তিন দিনে প্রতিভাবেন সম্পর্কেও কিছু কিছু জানতে পেরেছে মধুরা। বাড়ির ছাদে একটা মন্দির আছে। ভদ্রমহিলা প্রায় সারাদিনই সেখানে থাকেন। দু'বার মাত্র খান। খাবার সময়টা নীচে নামেন আর তখনই সোমেশের খোঁজ নিয়ে যান।
এই তিন দিনে স্পষ্টভাবে না দেখলেও মধুরা টের পেয়েছে, সেই নীল চশমা পরা চোখদুটো সারাক্ষণ তার পেছন পেছন যেন ঘুরছে।

আজ শুক্রবার।
দুপুরের ফ্লাইটে ধীরুভাই দেশাই ফিরে আসবেন। সকালে ঘুম থেকে উঠবার পরই কথাটা মনে পড়ে গেল মধুরার। সঙ্গে সঙ্গে ভয় আর উত্তেজনা মিলে তার হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন আচমকা দশগুণ বাড়িয়ে দিল। সময় যত কাটতে লাগল, তার অস্থিরতাও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল।
প্রথম রাউণ্ডটা মোটামুটি পেরিয়ে এসেছে মধুরা। ধীরুভাই দেশাই এখানে পৌঁছুবার পর আসল কাজটা শুরু হবে তার। গোকুলদাসের কাছে সে শুনেছে, ধীরুভাই দেশাই প্রচণ্ড ধূর্ত এবং বুদ্ধিমান। সামান্য একটা ভুল হয়ে গেলে তার ফল হবে মারাত্মক। কাজেই এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত চোখ কান এবং স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে রাখতে হবে।
রুটিন অনুযায়ী অন্য দিনের মতো আজও যাবতীয় কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে করে যেতে লাগল মধুরা। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যাবে না তার ভেতরে কী চলছে।
দুপুর বেলা সোমেশ আর সে যখন লাঞ্চ করছে সেই সময় কাচের জানালার বাইরে চোখ যেতেই মধুরা দেখতে পেল, একটা দামী এয়ার-কণ্ডিশানড লিমুজিন গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।
লঞ্চের পর সোমেশ যখন চোখ বুজে বিশ্রাম করছে আর মধুরা তার নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসে আছে, হঠাৎ দেখা গেল সেই লিমুজিনটা ফিরে এসে সোজা পোর্টিকোর দিকে চলে গেল। গাড়িটার জানালায় হাল্‌কা নীলাভ

কাচ। আবছাভাবে বোঝা গেল ব্যাকসীটে কেউ একজন বসে আছে। কিন্তু পোর্টিকোর নীচে চলে যাওয়ায় এখন আর গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বাদে সোমেশ চোখ মেললে একটা ইঞ্জেকসান দিল মধুরা। তারপর তুলো দিয়ে ছুঁচ ফোটানোর জায়গাটা যখন সে আস্তে ডলে দিচ্ছে সেই সময় রোমিও এ ঘরে এল। মধুরাকে বলল, 'বড় সাহেব একটু আগে ফিরে এসেছেন। আপনাকে একবার ডাকছেন।'

এ বাড়িতে ধীরুভাই দেশাইকে যে সবাই বড় সাহেব বলে এই চারদিনে জেনে গেছে মধুরা। এতক্ষণে বোঝা গেল, লিমুজিনে ধীরুভাই বসে ছিলেন। তাঁকে আনার জন্য ওটা এয়ারপোর্টে গিয়েছিল।

আচমকা কী যেন হয়ে গেল মধুরার। এতক্ষণের সব ভয় এবং উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে সোজা উঠে দাঁড়াল। সে বুঝতে পারছে, টেনসান বা ভয়ের মধ্যে থাকলে অবধারিত গোলমাল করে ফেলবে। এখন ঠাণ্ডা মাথায় তাকে এগুতে হবে।

মধুরা বলল, 'আমাকে কি তোমার সঙ্গে যেতে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।' রোমিও মাথা নাড়ল।

'আমি একটু দেখা করে আসছি।' বলে সোমেশের দিকে ফিরতেই মধুরার চোখে পড়ল তার মুখটা কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠেছে। মধুরা ধীরুভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার কথা বলায় সে কি খুশী না? ঠিক বোঝা গেল না।

অন্য দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নীরস গলায় সোমেশ বলল, 'ঠিক আছে।'

কয়েক পলক সোমেশের দিকে তাকিয়ে রইল মধুরা। তারপর অনেকখানি অস্বস্তি নিয়ে রোমিওর সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

রোমিও মধুরাকে নিয়ে সোজা চলে এল দোতলার ড্রইং রুমে। সেখানে ধীরুভাই দেশাই এবং প্রতিভাবেন বসে ছিলেন।

রোমিও কিন্তু এক সেকেণ্ডও আর দাঁড়ায় নি। মধুরাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই চলে গেছে।

মধুরা বাইরে থেকে বলল, 'ভেতরে আসতে পারি?'

প্রতিভাবেন বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো।' মধুরা ভেতরে যেতেই বসতে

বললেন।

একটু দূরে একটা সোফায় বসে পড়ল মধুরা, আর চোখের কোণ দিয়ে ধীরুভাইকে লক্ষ্য করতে লাগল।

ষাটের কাছাকাছি বয়স হবে তাঁর। মেদশূন্য চেহারা, কাটা কাটা মুখ, টানা নাক। এই বয়সেও মাথার চুল বেশির ভাগ কালো। পরনে ধবধবে পাজামা আর পাঞ্জাবি, ব্যাকব্রাশ করা চুল। মুখে পাইপ, চোখে পুরু লেন্সের বাইফোকাল চশমা।

দেখামাত্র ধীরুভাইকে চিনতে পারল মধুরা। কেননা গোকুলদাস এঁর ফোটো বেশ কয়েকবার তাকে দেখিয়েছে। যাতে ভুলে না যায় সে জন্য এঁর পোস্টকার্ড সাইজের একটা ছবিও তাকে দিয়েছিল সে। সেটা অবশ্য সঙ্গে করে আনে নি মধুরা; মাহিমে তাদের সেই 'চাওলে'র ঘরে একটা ভাঙা আলমারিতে লুকনো আছে।

ধীরুভাইকে দেখলে মনে হয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বা ইনটেলেকচুয়াল। কে বলবে লোকটা এ দেশের সব চাইতে বড় ডায়মণ্ড স্মাগলার! কোটি কোটি টাকার হীরা ইণ্ডিয়া থেকে বিদেশে পাচার করে দিচ্ছেন।

প্রতিভাবেন দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন।

পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ধীরুভাই বললেন, 'আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম সোমেশ তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে। ওর মেজাজের সঙ্গে অ্যাড-জাস্ট করে চলা নেক্সট টু ইমপসিবল। তুমি যে পেরেছ সে জন্যে আই অ্যাম হ্যাপি!'

মধুরা উত্তর দিল না। প্রশংসা শুনলে চুপ করে থাকটাই রীতি।

ধীরুভাই এবার বললেন, 'দিন চারেক হল, তুমি তো সোমেশকে দেখছ। কী মনে হচ্ছে—ও উঠে দাঁড়াতে পারবে? বুঝতেই পারছ, ও আমাদের একমাত্র ছেলে। সারা জীবন যদি পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে আমাদের পক্ষে সেটা কতখানি মর্মান্তিক।'

মধুরা বলল, 'ওঁর সেনসরি নার্ভগুলো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় নি। চেষ্টা করে গেলে হয়ত একদিন উঠে দাঁড়াতে পারবেন। তবে সব কিছু নির্ভর

করছে ওঁর মনের জোর আর সময়ের ওপর। মেণ্টাল স্ট্রেনথ্‌টা ফিরিয়ে এনে ওঁকে দাঁড় করাতে দু-এক মাস লাগতে পারে, আবার দু-চার বছর লাগাও অসম্ভব না।'

'যত দিন লাগে, তুমি চেষ্টা করে যাও।'

একটু চুপচাপ। তারপর ধীরুভাই আবার বললেন, 'আমার স্ত্রী বলছিলেন, তুমি নাকি সোমেশকে বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাও।'

মধুরা আস্তে আস্তে সোজা হয়ে বসল। কথাবার্তা এখন একটা দারুণ জায়গায় এসে পৌঁছেছে। সুযোগটা এখন পুরোপুরি কাজে লাগানো দরকার। সে বলল, 'হ্যাঁ। আমার পেশেণ্টও তাই চান।'

'বাইরে নিয়ে গেলে কিছু উপকার হবে বলে মনে হয়?'

'হ্যাঁ। ওঁর অসুখের সঙ্গে মনেরও যোগ আছে। মনটা ভাল রাখতে পারলে কাজ হবে। আমি এরকম আরো কিছু পেশেণ্ট দেখেছি যাদের ন্যাচারাল সারাউণ্ডিংয়ে নিয়ে গিয়ে ভাল রেজাল্ট পাওয়া গেছে।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী ভাবলেন ধীরুভাই। তারপর বললেন, 'নানা কারণে সোমেশকে বাইরে যেতে দিই না।' বলতে বলতে সোজা মধুরার চোখের দিকে তাকালেন, 'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ বাইরে যেতে দেব। তবে বেশি দূরে নিয়ে যেতে পারবে না। 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের নীচের দিকের বীচে যেতে পার। পাঁচটা নাগাদ একটা বয়-টয় কেউ হুইলচেয়ার ঠেলে ওখানে দিয়ে আসবে, আর সানসেটের আগে ফিরে আসতে হবে।'

ধীরুভাই যে এত সহজে রাজী হয়ে যাবেন, মধুরা ভাবতে পারে নি। হয়ত তার সারল্যমাখানো পবিত্র মুখ দেখে তিনি কোনরকম সন্দেহ করেন নি। কিংবা প্রতিভাবেন তার সম্বন্ধে ভাল সার্টিফিকেটও দিয়ে থাকতে পারেন। পরক্ষণেই মধুরার মনে হল, এটা ধীরুভাইয়ের চালও হতে পারে। তার কথায় সায় দিয়ে হয়ত একটু বাজিয়ে নিতে চাইছেন। যা-ই হোক না, তাকে খুব সাবধানে পা ফেলতে হবে।

মধুরা বলল, 'আপনি যা বলছেন তাই করব। রোজ বীচে ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়ে আনতে পারলে পেশেণ্টের যথেষ্ট ইমপ্রুভমেণ্ট হবে বলেই আমার ধারণা।'

'ঠিক আছে।'

'আজ থেকেই পেশেন্টকে নিয়ে বীচে যেতে পারি তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' ধীরুভাই বললেন, 'তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল। আচ্ছা, এবার তা হলে সোমেশের ঘরে যাও।'

মধুরা যখন দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে, হঠাৎ ধীরুভাই বললেন, 'একটু দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। অনেকদিন ছেলেটাকে দেখা হয় নি—'

একটু পর তেতলায় সোমেশের ঘরের কাছে এসে ধীরুভাই বললেন, 'আসব রে সোমেশ?'

ছেলের অনুমতি নিয়ে বাবাকে তার ঘরে ঢুকতে হয়, এমন কথা আগে শোনে নি মধুরা। সে রীতিমত অবাকই হয়ে গেল। তার চোখে পড়ল, ধীরুভাইকে দেখে সোমেশের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। ঘৃণা এবং রাগে চোখের তারা দপ দপ করছে, ঠোঁট কুঁচকে গেছে।

ধীরুভাই আবার বললেন, 'তুই কেমন আছিস?'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সোমেশ, 'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে! গেট আউট, গেট আউট—'

ধীরুভাই যে ছেলেকে মারাত্মক ভয় করেন, সেটা বোঝা গেল। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।' যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই মধুরার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। সে তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

সমস্ত ব্যাপারটা এমনই অস্বস্তিকর এবং অপমানজনক যে ধীরুভাই কী করবেন ভেবে পেলেন না। তারপর অবশ্য মধুরার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ছেলেটা ভীষণ টেমপারামেণ্টাল। কখন কাকে কী বলবে, কী করবে, কিছু ঠিক নেই।' বলে আর দাঁড়ালেন না; লম্বা লম্বা পা ফেলে করিডর ধরে সোজা চলে গেলেন।

বাবা এবং ছেলের সম্পর্কটা কেন যে এমন অস্বাভাবিক, বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল মধুরা। তারপর আস্তে আস্তে সোমেশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

৭

বিকেল পাঁচটায় একটা বেয়ারা সোমেশকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে বীচের দিকে চলেছে। পাশাপাশি হাঁটছে মধুরা।

দারুণ খুশী দেখাচ্ছে সোমেশকে। চোখমুখ ভারি উজ্জ্বল। তার ভেতর থেকে আনন্দ যেন ঠিকরে ঠিকরে উঠে আসছে। ভিলে পার্লের স্কীমের রাস্তাটা যেখানে বাঁক ঘুরে 'হরাইজন' হোটেলের দিকে গেছে, সেখানে আসতেই সে বলল, 'আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। কত দিন পর বাইরে আসতে পারলাম। সব—সব আপনার জন্যে।'

মধুরা হাসল; উত্তর দিল না।

সোমেশ আবার বলল, 'আমার ভীষণ ভাল লাগছে মিস পুনেকর।'

টুকরো টুকরো এলোমেলো কথা বলতে বলতে ওরা একসময় 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' হোটেলের নীচে সোনালী বালির বীচে চলে এল। একেবারে জলের ধার ঘেঁষে হুইল চেয়ারটা পৌঁছে দিয়ে বেয়ারাটা বলল, এখন সে ফিরে যাচ্ছে, ঘণ্টাখানেক বাদে এসে সোমেশদের বাড়ি নিয়ে যাবে।

সোমেশ বলল, 'আমাকে বালিতে নামিয়ে দিয়ে যাও।'

মধুরা আপত্তি করল কিন্তু সোমেশ কিছুতেই শুনলো না। অগত্যা তাকে বালিতে বসিয়ে দিয়ে বেয়ারাটা মেরিগোল্ডে চলে গেল।

বেলা পাঁচটাতেও বোম্বাইতে অজস্র রোদ থাকে। আদিগন্ত অ্যারেবিয়ান সী, উল্টোপাল্টা সামুদ্রিক হাওয়া, সীগালের ঝাঁক, নারকেল গাছের মাথায় একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ, শেষ বেলার রক্তবর্ণ সূর্য—সব মিলিয়ে যেন প্রকৃতির আশ্চর্য এক আর্ট গ্যালারি। চারদিক দেখতে দেখতে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল সোমেশ। বাইরে নিয়ে আসার জন্য বার বার ঘুরে ঘুরে মধুরাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল সে।

এই জায়গাটা তুলনায় নির্জন। তবে বাঁ দিকে খানিকটা দূরে বেশ লোক-

জন দেখা যাচ্ছে। 'পনি' আর উটে চড়ে কয়েকটা বিদেশী টুরিস্ট 'জয় রাইড' করে বেড়াচ্ছে।

মধুরা সোমেশের সঙ্গে গল্প করছে ঠিকই কিন্তু মাঝে মাঝেই ঘাড় ফিরিয়ে এধারে ওধারে তাকাচ্ছে। সে জানে, মহেশ এই বিশাল 'বীচে'র কোথাও না কোথাও আছে। রোজ বিকেলে তার এখানে আসার কথা।

চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। বাঁ দিকে কিছুটা কোণা-কুণি যেখানে নারকেল গাছের লাইনের ভেতর ভেলপুরী আর বাটাটা পুরীর সারবন্দী দোকানগুলো ঘিরে থোকা থোকা ভিড় জমেছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ। সোমেশ যাতে দেখতে না পায় সেভাবে কাত হয়ে বসে হাতের ইসারায় মধুরা জানিয়ে দিল, মহেশ যেন ওখানেই থাকে, এদিকে চলে না আসে। কিন্তু তার পক্ষেও সোমেশকে ফেলে উঠে গিয়ে মহেশের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব না। কী অছিলায় যাওয়া যায় যখন ভাবছে, সেই সময় সুযোগটা হাতে এসে গেল।

সোমেশ আচমকা বলে উঠল, 'অনেক দিন ভেলপুরী খাই না। ভীষণ খেতে ইচ্ছে করছে। ওখানে দোকান রয়েছে, নিয়ে আসুন না প্লীজ—' পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিল সে।

সোমেশের যা অসুখ তাতে ভেলপুরী ক্ষতিকর কিছু নয়। নোটটা নিয়ে উঠে পড়ল মধুরা।

সোমেশ হেসে হেসে আর ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে বলল, 'ফিরে এলে আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কীসের সারপ্রাইজ?'

'সেটা এখন বলে দিলে পরে মজাটা আর থাকবে কি?'

মধুরা বীচের বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে ভেলপুরীওয়ালাদের কাছে চলে এল। মহেশ কোনরকম তাড়াহুড়ো করল না। অন্য দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মধুরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

মধুরা একটা দোকানে ভেলপুরী বানাতে বলে চাপা গলায় চারপাশের মানুষজনের কান বাঁচিয়ে বলল, 'ধীরুভাই দেশাই ফিরে এসেছেন।'

মহেশ বলল, 'পুরনো খবর।'

'উনি বোম্বাইতে ছিলেন না বলে বীচে আসতে পারছিলাম না। সোমেশকে এখানে আনার পারমিশান আদায় করেছি। এখন থেকে রোজ বীচে আসতে পারব।'

'গুড। গোকুলদাসজী এ খবর পেলে খুশী হবেন। টেপ রেকর্ডারগুলোর কী ব্যবস্থা করেছ?'

'এখনও কিছু করা হয় নি। ধীরুভাই সবে এলেন। এবার ওগুলো কাজে লাগাব।'

'ঠিক আছে। কাল আবার আসব। গোকুলদাসজীকে আর কোন খবর দেবে?'

হঠাৎ সেই নীল গগলস পরা চোখ দুটোর কথা মনে পড়ে গেল মধুরার। সে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, মেরিগোল্ডে কেউ আমাকে ওয়াচ করছে।'

মহেশ বলল, 'বী কেয়ারফুল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সাবধানেই আছি।'

মহেশ আর কিছু বলল না; বীচের ওপারে উঁচু রাস্তার দিকে চলে গেল।

ভেলপুরী বানানো হয়ে গিয়েছিল। দাম মিটিয়ে দুটো বড় বড় কাগজের ঠোঙা হাতে করে সোমেশের কাছে ফিরে এল মধুরা। একটা ঠোঙা সোমেশকে দিয়ে বলল, 'কী সারপ্রাইজ যেন দেবেন বলেছিলেন—'

সোমেশ তার পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিল। সেখানে বালির ওপর আঙুল দিয়ে লেখা আছে: আমি আপনাকে আপনি-টাপনি করে বলতে পারব না।

মধুরা একটু হেসে সোমেশের লেখাটার তলায় লিখল: আমার আপত্তি নেই।

সোমেশ লিখল: ব্যাপারটা একতরফা চলবে না। আমাকেও তুমি করে বলতে হবে।

এরপর লেখালিখির খেলা চলল বেশ কিছুক্ষণ। মধুরা সোমেশের লেখার জবাব দিল এভাবে: তুমি করে বলতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে।

: কী শর্ত ?

: মনের জোর এনে উঠে দাঁড়াতে হবে।

: সিনসিয়ারলি চেষ্টা করব।

: এখনই চেষ্টা করলে আমি খুব খুশী হব।

: আজ না, কাল থেকে। প্লীজ—

এই সব লেখাটেখার মধ্যে সেই বেয়ারাটা আবার বীচে এল। সোমেশরা এখানে আসার পর একটি ঘণ্টা কেটে গেছে। দূর দিগন্তে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে সমুদ্রে মিশেছে কখন যে সূর্যটা সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে টের পাওয়া যায় নি। একটু পরেই সেটা টুপ করে সমুদ্রে ডুবে যাবে। ধীরুভাই বলে দিয়েছেন, সূর্যাস্তের আগেই বাড়ি ফিরে যেতে হবে। কাজেই বেয়ারাটা সোমেশকে হুইল চেয়ারে তুলে ঠেলতে ঠেলতে ভিলে পার্লে স্কীমের দিকে এগিয়ে চলল। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল মধুরা।

৮

বীচ থেকে ফেরার পর রুটিন অনুযায়ী সব কাজই করে গেল মধুরা। তারপর রাতের খাওয়া চুকিয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

অন্য দিন শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে মধুরা। আজ তাকে জেগে থাকতে হবে। অনেক রাত্তিরে মেরিগোল্ড নিঝুম হয়ে গেলে টেপরেকর্ডারগুলো নিয়ে সে বেরুবে। ওগুলো কোথায় কোথায় বসাতে হবে, আগেই সব জানিয়ে দিয়েছে গোকুলদাস।

তবু মনে হলো, আরো একবার এ বাড়ির নকশাটা দেখে নেওয়া দরকার। 'মেরিগোল্ডে'র প্ল্যান, তার জাল সার্টিফিকেট এবং টেপরেকর্ডারগুলো রয়েছে সেই স্যুটকেশটায়। স্যুটকেশটা ওয়ার্ডরোবে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে রেখেছে সে। ওয়ার্ডরোব আর স্যুটকেশের চাবিদুটো সর্বক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

ভাবামাত্র উঠে পড়ল মধুরা। ওয়ার্ডরোব এবং স্যুটকেশ খুলে প্ল্যান আর ছ'টা টেপরেকর্ডার বার করল সে। তারপর প্ল্যানটা বিছানায় ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

এ বাড়ির প্রতিটি ফ্লোরে একটা করে ড্রইং রুম রয়েছে। দোতলায় রয়েছে ধীরুভাই আর প্রতিভাবেনের বেডরুম। ওঁদের বেডরুম ছাড়াও এখানেই রয়েছে ধীরুভাইয়ের একটা প্রাইভেট চেম্বার। গোকুলদাস বার বার বলেছে, এই চেম্বারে বসেই ধীরুভাই তার কাজকর্ম করে থাকেন। ড্রইং রুমের পাশে এই বিশেষ ঘরটা চোখেও পড়েছে মধুরার। আপাতত এই পাঁচ জায়গায় পাঁচটা টেপরেকর্ডার তাকে বসাতে হবে। বাকী যেটা থাকবে সেটা নিয়ে কী করা যায় পরে ভেবে দেখবে।

মধুরা মনে মনে ঠিক করে নিল, আজ রাত্তিরেই তিনটি টেপরেকর্ডার বসাবে।

আজ আর ধীরুভাইদের বেডরুমে যাওয়া যাবে না। তবে তেতলার এবং দোতলার ড্রইং রুমে এবং ধীরুভাইয়ের চেম্বারে বসাবার চেষ্টা করবে। দুই ড্রইং রুমের কোন গোপন জায়গায় সবার চোখের আড়ালে ওগুলো রাখতে হবে তাও দেখে রেখেছে সে।

অবশ্য ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বারে এখনও পর্যন্ত ঢোকা হয় নি। যেভাবেই হোক, আজ ঢুকতে হবে।

তিনটে টেপরেকর্ডার বাইরে রেখে বাকীগুলো স্যুটকেশে পুরে ওয়ার্ডরোবে ঢুকিয়ে চাবি লাগাল মধুরা। চাবি আর বাইরের টেপরেকর্ডারগুলো শাড়ির তলায় লুকিয়ে আলো নিভিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

অন্য দিন রাত্তিরে প্যাসেজের আলো জ্বালানো থাকে। আজ এ দিকটা পুরোপুরি অন্ধকার। হয়ত বাড়ির কাজের লোকেরা ভুল করে নিভিয়ে দিয়েছে।

অন্ধকার থাকায় সুবিধাই হল। আলোতে কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। মধুরা তা একেবারেই চায় না।

অন্ধকারে প্যাসেজের দু ধারে যতদূর দেখা যায়, দেখে নিল সে। যেটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, কেউ কোথাও নেই। বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ডান দিকে এগিয়ে গেল মধুরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে বাঁ দিকে ঘুরে একটু এগুলেই তেতলার ড্রইংরুম। সেখানে পৌঁছুতেই দেখা গেল, ঘরটার দরজা খোলা রয়েছে।

রাত্তিরে ড্রইং রুম খোলা থাকে কিনা, মধুরা জানে না। যে নীল গগলস পরা লোকটা তার ওপর নজর রাখছে সে কি জানে, আজ সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মধুরা এ ঘরে আসবে? এটা ফাঁদ নয় তো?

অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে মধুরা দরজার বাইরে থেকে ঘরে মুখ বাড়াল। অন্ধকারে চার ফুটের বেশি নজর চলে না। কেউ ভেতরে আছে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ না। আরেকটু এগুলেই ধীরুভাইদের

বেডরুম। এই মুহূর্তে হুট করে ওঁদের বেরুনোর সম্ভাবনা নেই। তবু জোর করে কিছুই বলা যায় না। এত রাত্তিরে মধুরাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে তার ফলাফল হবে খুবই বিপজ্জনক। তা ছাড়া বেয়ারা চাকরদের কেউ বেরিয়ে পড়তে পারে।

কাজেই যা হবার হোক, ঝুঁকি একটা নিতেই হবে। এতটা এসে ফিরে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব না। রুদ্ধশ্বাসে ড্রইং রুমে ঢুকে পড়ল মধুরা।

বার বার এ ঘরে এসে এখানকার সব কিছু ফোটোগ্রাফের মতো মাথায় তুলে নিয়েছে মধুরা। এ বাড়ির প্রতিটি ঘরে চোখ বুজে ঘুরে আসতে পারে সে। কোথায় কী আছে সব তার মুখস্থ।

মধুরা জানে দরজা থেকে ডান দিকে কোণাকুণি পনের পা গেলে অগুনতি সোফা আর সেণ্টার-টেবল সাজানো রয়েছে। এতটুকু শব্দ না করে সোজা সোফাগুলোর কাছে চলে গেল সে। তারপর একটা সোফার তলায় খাঁজের ভেতর টেপরেকর্ডারটা ঢুকিয়ে চালু করে দিল। ওটাতে যে ব্যাটারি আছে, তাতে সাত দিন চলে যাবে। মধুরা লক্ষ্য করেছে, সোফাগুলো নাড়াচাড়া করা হয় না। কাজেই টেপরেকর্ডারে কারো হাত পড়ার সম্ভাবনা নেই।

এ ঘরের কাজ চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মধুরা। এবার তাকে দোতলায় যেতে হবে।

লিফটের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। তারপর ঘুরে সিঁড়ির দিকে গেল। লিফটে করে নামলে তার আওয়াজে কেউ জেগে যেতে পারে। সেটা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে চুপচাপ দোতলায় নেমে এল মধুরা। এখানেও তেতলার মতোই চারদিক অন্ধকার। ড্রইং রুমের দরজাও এখানে খোলাই পাওয়া গেল। ফলে সোফার নিচে টেপরেকর্ডার বসাতে দু মিনিটও লাগল না।

এই ফ্লোরে ড্রইং রুমের পাশেই ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বার। সেখানে যেতেই বোঝা গেল, চেম্বারের দরজায় 'লক' লাগানো। কাজেই এ ঘরে

ঢোকা অসম্ভব। মধুরা ভাবল, মহেশকে কালই খানিকটা মোম দিয়ে যেতে বলবে। মোম গলিয়ে ছাঁচ তুলে মহেশের হাতে দিলেই একদিনে সে ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে এনে দেবে।

আরো একটা টেপরেকর্ডার বসানো বাকী আছে। মধুরা ভাবল, ওটা আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না, গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ড্রইং রুমে বসিয়ে আসবে।

একতলায় নেমে ড্রইং রুমের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে যেতে হল এখানেও আলো নেই। গাঢ় অন্ধকারে খুব সরু একটা আলোর লাইন দেয়ালের গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে কিছু খুঁজছে। একটু পর দেয়াল থেকে টর্চের আলোটা মেঝেতে নেমে এল। দেখা গেল, অনেকটা জায়গায় কার্পেট সরে যাচ্ছে। আর টর্চের আলোটা মেঝেতে ঘুরছে।

এই মধ্যরাতে কে এভাবে গোপনে আলো জ্বালিয়ে দেয়াল আর মেঝে দেখছে? কী খুঁজছে সে?

এখানে দাঁড়িয়ে থাকা কি আর উচিত হবে? দারুণ উত্তেজনায় এবং ভয়ে হৃৎপিণ্ডে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল মধুরার। হঠাৎ সে ঠিক করল, যাবে না; ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য এক কৌতূহলও তাকে যেন পেয়ে বসেছে। মধুরা ঠিক করল, দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য লোকটার গতিবিধি লক্ষ্য করবে। এই ড্রইং রুমে নিশ্চয়ই গোপন কোন রহস্য লুকনো আছে।

পিছু হেঁটে দেয়ালের দিকে যেতে গিয়ে তার ধাক্কায় একটা টীপয় থেকে পেতলের ফুলদানি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঠুন করে একটা ধাতব শব্দ হল। আর তক্ষুনি ওধারে টর্চটা নিভে গেল।

মধুরা বুঝতে পারল, এখানে এক মুহূর্তও থাকা ঠিক হবে না। সে দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলে গেল এবং এক সঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে তেতলায় নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল।

৯

দিন কয়েক কেটে গেল। এর মধ্যে তেমন কিছু ঘটে নি। পুরনো রুটিন অনুযায়ী সব চলছে। অর্থাৎ ঠিক সময়ে সোমেশকে ওষুধ খাওয়ানো, ইনফ্রা-রে বা ইঞ্জেকসান দেওয়া, এক সঙ্গে লাঞ্চ ডিনার এবং ব্রেকফাস্ট খাওয়া—কোথাও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন নেই। বিকেলেও যথারীতি সোমেশকে নিয়ে 'বীচে' যাচ্ছে সে এবং সূর্যাস্তের আগে ফিরেও আসছে।

তবে এর মধ্যে মহেশকে দিয়ে মোম আর পেন্সিল টর্চ আনিয়ে নিয়েছে মধুরা। ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বারের 'লকে'র ছাঁচ তুলে মহেশকে দেওয়ার পরদিনই একটা চাবি বানিয়ে এনে দিয়েছে সে। চাবিটা পাওয়ায় মধুরার পক্ষে স্পেশাল চেম্বারে টেপরেকর্ডার বসিয়ে আসতে অসুবিধা হয় নি। ধীরুভাইদের বেডরুমেও খাটের তলায় এবং গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ড্রইং রুমে একটা করে টেপরেকর্ডারও বসিয়ে এসেছে। সেদিন একতলার দেয়ালে এবং মেঝেতে যে পেন্সিল টর্চের আলো ঘুরতে দেখা গিয়েছিল সে সব জায়গা গোপনে দেখে এসেছে মধুরা কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই বোঝা যায় নি। এই পেন্সিল টর্চের ব্যাপারটা মহেশ মারফত গোকুলদাসকে জানিয়েও দিয়েছে সে।

গোকুলদাস মহেশকে দিয়ে রোজই জানাচ্ছে, এ বাড়িতে ধীরুভাই দেশাই-য়ের কাছে কে কে আসে, তাদের ওপর যেন নজর রাখে মধুরা এবং তাদের সম্পর্কে যাবতীয় খবর যোগাড় করে। আর পেন্সিল টর্চ নিয়ে মাঝরাতে কে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাকে যেন খুঁজে বার করে।

তেতলায় সোমেশের ঘরে যেখানে প্রায় সারাদিন এবং রাতের অনেকটা সময় পর্যন্ত মধুরা বসে থাকে, সেখান থেকে কাচের জানালা দিয়ে এ বাড়ির গেটটা দেখা যায়। কেউ এলে মধুরার চোখে পড়বেই। চার দিন হল ধীরুভাই বোম্বাই ফিরেছেন। কিন্তু এখনও কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে

আসে নি। অবশ্য যে সময়টা মধুরা সোমেশকে নিয়ে 'বীচে' বেড়াতে যায় এবং রাত্তিরে সে যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন কেউ আসে কিনা, জানা সম্ভব হয় নি।

এদিকে এই ক'দিনে সোমেশ তার ওপর আরো অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাকে ছাড়া এখন এক মুহূর্তও সোমেশের চলে না।

আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সোমেশ চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে আর তার মাথার কাছে সেই চেয়ারটায় বসে আছে মধুরা। তার চোখ কাচের জানলার দিকে ফেরানো। জানালার পাল্লা খোলাই রয়েছে।

হঠাৎ মধুরার চোখে পড়ল, মধ্যবয়সী একটা লোক গেট পেরিয়ে ভেতরে আসছে। দারোয়ান খুব সম্ভব তাকে চেনে, তাই আটকালো না। লোকটা সোজা 'লনে'র ভেতরকার রাস্তা ধরে পোর্টিকোর তলায় চলে গেল। ফলে তাকে আর দেখা গেল না।

'মেরিগোল্ডে' আসার পর এই প্রথম একটা অচেনা লোককে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখল মধুরা। এর সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু কীভাবে? সোমেশ ঘুমোচ্ছে। এ সময় মধুরার কোন কাজও নেই। চুপচাপ নীচে গিয়ে লোকটা কার কাছে কী উদ্দেশ্যে এসেছে, জানার চেষ্টা করতে পারে সে। অবশ্য এ বাড়িতে ডজন খানেক চাকর আর বেয়ারা রয়েছে। এই দিনের বেলা নীচে নামলে সবার চোখেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা। এমনভাবে তাকে যেতে হবে যাতে কারো কোনরকম সন্দেহ না হয়। সবার মনে হবে, সে যেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরক্ষণেই মধুরা ভাবল, লোকটা যদি গোপন কোন দরকারে ধীরুভাইয়ের কাছে আসে, নিশ্চয়ই অন্য কারো সামনে বসে তিনি তার সঙ্গে কথা বলবেন না। তাকে নিয়ে হয় নিজের স্পেশাল চেম্বারে বা বেডরুমে চলে যাবেন। যেখানেই যান, সব জায়গায় জোরালো টেপরেকর্ডার বসানো আছে। ওদের কথাবার্তা তাতে ধরা থাকবে। কাজেই তাড়াহুড়ো করে কোনরকম ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। সুযোগ করে একসময় টেপরেকর্ডার-

-গুলো নিয়ে এলেই হবে।

এ জাতীয় নানারকম ব্যাপার ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখ জড়িয়ে এসেছিল, মধুরার মনে নেই। এমনিতে দুপুরে ঘুমোয় না সে। আজ কেন যেন ঘুমটা তাকে ছাড়ল না।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মধুরার। তক্ষুনি চোখে পড়ল, তার বুকের কাপড় খসে মেঝেতে লুটোচ্ছে। আর সোমেশ শরীরের ওপর দিকের সজীব অংশটা তার দিকে অনেকখানি কাত করে পলকহীন তাকিয়ে আছে। তার চোখে লাম্পট্যের ছাপ নেই, যা আছে তা হল নিষ্পাপ মুগ্ধতা।

বড় হবার পর থেকে রাস্তায় বেরুলেই সে টের পেয়ে আসছে, হাজার হাজার পুরুষের চোখ যেন তার শরীর চাটতে থাকে। এই জঘন্য টাইপের লোক-গুলোর কুৎসিত নোংরা চাউনির অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রথম প্রথম গা ঘিনঘিন করত তার। এখন সে আর এসব গ্রাহ্য করে না।

কিন্তু জীবনে এই প্রথম একটি যুবকের এমন আশ্চর্য পবিত্র আর মুগ্ধ চাউনি দেখল মধুরা। দ্রুত শাড়ির লুটানো অংশটা তুলে বুক ঢেকে নতমুখে বসে রইল সে। সুখের মতো কোন অনুভূতি আর অদ্ভুত এক লজ্জা তার হৃৎপিণ্ডে মৃদু ঢেউয়ের মতো বয়ে যেতে লাগল।

খুব আস্তে নীচু গলায় সোমেশ বলল, 'ইউ আর বিউটিফুল। তোমার মতো সুন্দর মেয়ে আমি আর দেখিনি।'

সোমেশের কণ্ঠস্বর যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। এমন গলা আগে আর কখনও শোনে নি মধুরা। বাবা মারা যাবার পর তার চারপাশে যত লোক ভিড় করেছে তারা প্রায় সবাই লম্পট, মাতাল এবং ভয়াবহ টাইপের ক্রিমিনাল। এই প্রথম একটি যুবককে দেখল যার মধ্যে কোনরকম মালিন্য নেই।

মধুরা বলল, 'আমার চেয়ে অনেক সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আছে।'

সোমেশ বলল, 'তা থাকতে পারে। যার যেমন দেখার চোখ।'

মধুরা উত্তর দিল না।

সোমেশ আবার বলল, 'কাল থেকে একটা কথা ভীষণ ভাবছি।'
মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা ?'
'আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে না তো ?'
মধুরা চমকে উঠল। সোমেশ যা বলল, তার অর্থ মোটামুটি বুঝতে অসুবিধে হয় না। সে তার সম্পর্কে কিছুই না জেনে পুরোপুরি নির্ভর তো করেছেই, তাকে বিশ্বাসও করে বসে আছে। অথচ এত নির্ভরতা এবং বিশ্বাসের যোগ্য সে নয়। সোমেশ তো জানে না, কত বড় ক্ষতি করার জন্য 'মেরিগোল্ডে' এসেছে সে। দারুণ এক অস্বস্তি ঘুণপোকার মতো তার বুকের ভেতর কী যেন কাটতে লাগল। আবছা গলায় মধুরা বলল, 'আমি তো আছিই তোমার কাছে।'
একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমেশ বলল, 'ক'দিন ধরে আমার কী ইচ্ছে হচ্ছে জানো ?'
'কী ?'
'যদি উঠে দাঁড়াতে পারতাম।'
'তুমি ইচ্ছা করলেই তো পার। শুধু মনের জোরটা নিয়ে আসতে চেষ্টা করো। বাকীটা আমি দেখব।'
মধুরার দিক থেকে চোখ সরিয়ে জানালার বাইরে তাকাল সোমেশ। তার-পর বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তোমাকে অনেক বার বলেছি আমার মনের জোর আর ফিরবে না।'
মধুরা বলল, 'কেন ফিরবে না ?'
হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল সোমেশ, 'কেন, জানতে চাও ?'
'চাই।'
'তার কারণ আমার বাবা। আমার যে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল—' বলতে বলতে চেঁচিয়ে উঠল সোমেশ, 'কে, কে ওখানে ?'
মধুরা দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে ডান পাশের জানালার দিকে তাকাল। জানালার পাল্লা দুটো ভেজানোই থাকে, এখন সামান্য ফাঁক করা রয়েছে। আর সেখান থেকে নীল গগলস পরা সেই চোখ দুটো সট করে সরে গেল।

দৌড়ে মধুরা বাইরের প্যাসেজে চলে এল। কিন্তু না, কেউ কোথাও আর নেই।

ফের ঘরে ফিরে আসতেই সোমেশ বলল, 'কে ছিল ওখানে ?'

মধুরা বলল, 'কাউকেই তো দেখলাম না।'

'তা হলে বোধহয় ভুল দেখেছি। কে আর লুকিয়ে আমাদের কথা শুনবে !'

সোমেশ যে ঠিকই দেখেছে তা আর বলল না মধুরা। বললে এই নিয়ে হৈচৈ পড়ে যাবে। ধীরুভাই এবং প্রতিভাবেন হয়ত বাড়িসুদ্ধ এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করে ফেলবে যাতে রাত্তিরে বেরিয়ে টেপরেকর্ডারগুলো নিয়ে আসাই তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

মধুরা বলল, 'তাই হবে। তোমার বাবার কথা কী যেন বলছিলে ?'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে সোমেশ বলল, 'আজ থাক। পরে বলব।'

মধুরা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিচের 'লনে'র দিক থেকে আবছা-ভাবে চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এল।

সোমেশ বলল, 'দেখ তো, কে চেঁচাচ্ছে।'

জানালার কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকল মধুরা। দুটো বেয়ারা আর দারোয়ান সেই মধ্যবয়সী লোকটাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। ধীরুভাই দেশাই 'লনে'র এ মাথায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলছেন। এত উঁচু থেকে তার একটি বর্ণও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তবে আন্দাজ করা গেল, ধীরুভাই লোকটাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বলছেন।

একটু অবাকই হল মধুরা। কিছুক্ষণ আগে ঐ লোকটাকে 'মেরিগোল্ডে' ঢুকতে দেখেছিল সে। হঠাৎ কী এমন ঘটল যাতে তাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে !

ঘাড় ধাক্কা খেতে খেতে লোকটা যখন গেটের বাইরে চলে গেছে সেই সময় আবার নিজের চেয়ারে এসে বসল মধুরা।

সোমেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হচ্ছে নীচে ?'

মধুরা যা যা দেখেছে, সব বলল।

বিরক্তিতে সোমেশের চোখ কুঁচকে গেল। এ ব্যাপারে সে আর কোনরকম কৌতূহল দেখাল না।

আরো কিছুক্ষণ পর পশ্চিম আকাশের গা বেয়ে সূর্যটা আরব সাগরের দিকে অনেকখানি নেমে গেলে সোমেশকে নিয়ে বীচে চলে এল মধুরা। যে বেয়ারাটা হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে, সে ওদের পৌঁছে দিয়ে আর দাঁড়াল না ; সোজা মেরিগোল্ডে ফিরে গেল।

রোজই বীচে এসে মধুরা দেখতে পায়, ভেলপুরী বাটাটা পুরীর দোকানগুলোর কাছে অপেক্ষা করছে মহেশ। এটা যেন অভ্রান্ত অনিবার্য কোন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। আজও নির্দিষ্ট জায়গাটিতে মহেশকে দেখা গেল। যতক্ষণ না মধুরা নিজে থেকে ওর কাছে যাচ্ছে, উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে মহেশ।

হুইল চেয়ার থেকে নিচের বালিতে সোমেশকে নামিয়ে খানিকক্ষণ তার অসাড় পায়ে কোমরে এবং উরুতে প্যাসিভ মুভমেণ্ট করল মধুরা। কিন্তু অ্যাক্টিভ মুভমেণ্টটা কিছুতেই হচ্ছে না। হাজার চেষ্টা করেও তার মনের জোরটা ফেরাতে পারছে না মধুরা।

অথচ একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, মধুরার কথামতো প্রাণপণে শরীরের নিচের দিকটা নাড়াতে চেষ্টা করছে সোমেশ। তার মুখ লাল হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত শরীরের ওপর দিকটা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্তভাবে সে বলল, 'না, আজও হল না। তবে তোমাকে যখন কথা দিয়েছি তখন রোজই চেষ্টা করে যাব।'

মধুরা বলল, 'চেষ্টা করতে করতেই একদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'তোমার সেই অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারটা বললে আমি ঠিকভাবে সাহায্য করতে পারতাম। এখন আন্দাজে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি মাত্র। অ্যাকসিডেণ্টের ব্যাপারে তোমার বাবার কথা কী যেন বলছিলে সেদিন—'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সোমেশ। তারপর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলতে

লাগল, 'আমার জীবনে সেটা একটা নাইটমেয়ার ; দুঃস্বপ্নই বলতে পার। আমার বাবাকে সেই ছেলেবেলায় এমন কিছু করতে দেখেছিলাম যার 'শকে'—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে।

দারুণ আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে মধুরা জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছিলেন তোমার বাবা ?'

সোজাসুজি এ প্রশ্নের উত্তর দিল না সোমেশ। বিষণ্ণ গলায় বলল, 'পৃথিবীতে কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করে নিজের গোপন কথা বলতেই হয়। নইলে দমবন্ধ হয়ে মানুষ মরে যেত। আমার ধারণা, তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারব। আর তুমি তার মর্যাদা রাখবে।'

ঠিক এ রকম একটা ব্যাপারের জন্য প্রস্তুত ছিল না মধুরা। সে চেয়েছিল কৌশলে এ বাড়ির যাবতীয় গোপন খবর বার করে গোকুলদাসের কাছে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এই যুবকটি তাকে বিশ্বাস করে নিজে থেকেই অনেক কিছু বলতে চাইছে। সে কি এতটা বিশ্বাসের সম্মান রাখবে না ? খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল মধুরা।

সোমেশ বলল, 'আজ থাক। অন্য একদিন তোমাকে সব বলব। শুধু এটুকু জেনে রাখ, বাবার জন্যে কাউকে নিজের মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না। আমি ঈশ্বর-টিশ্বর বিশ্বাস করি না। তবু মনে হয় আমার যে এই অবস্থা হয়েছে সেটা বাবারই পাপের ফল। এর চেয়ে যদি আমার মৃত্যু ঘটত !'

মধুরা উত্তর দিল না। সোমেশের কথার জবাবে তার কী-ই বা বলবার আছে !

কিছুক্ষণ পর সোমেশ ফের বলল, 'গলাটা শুকিয়ে গেছে। কোল্ড ড্রিংক কি আইস ক্রীম টিম কিছু নিয়ে এসো তো।'

মধুরাকে টাকা দেওয়াই আছে। নীচে এলেই ভেলপুরী হোক, বাটাটা পুরী হোক, দিল্লীর চাট হোক বা মাদ্রাজী দোসা হোক, কিছু না কিছু খেতে চায় সোমেশ। একঘেয়ে লাঞ্চ ডিনার খেয়ে খেয়ে তার মুখ হেজে গেছে। ডাক্তার দস্তুর জানিয়েছেন, সোমেশের পাকস্থলী যখন 'পারফেক্ট কণ্ডিসানে' আছে তখন যা খুশি তা-ই খেতে পারে সে।

কখন সোমেশ ভেলপুরী-টুরী আনতে বলবে, রোজ সেই সুযোগটার জন্যই যেন অপেক্ষা করে মধুরা। সোমেশের মুখ থেকে কোল্ড ড্রিংক বা আইস-ক্রীমের কথাটা খসার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে সোজা খাবারের স্টলগুলোর দিকে চলে গেল।

অন্যদিন যা করে আজও তাই করল মধুরা। প্রথমে আইসক্রীম কিনল না; নারকেল গাছের লাইনের ওধারে ফাঁকা জায়গায় চলে গেল। একটু পর এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে অন্যমনস্কর মতো মহেশ তার পাশে এসে দাঁড়াল। সোমেশ যেখানে বসে আছে সেখান থেকে সে ওদের দেখতে পাবে না।

মহেশ নিচু গলায় বলল, 'গোকুলদাসজী বলেছেন যে টেপ-রেকর্ডারগুলো মেরিগোল্ডের নানা জায়গায় বসিয়ে রেখেছ, সেগুলো কালই ওঁর চাই। আজ রাত্তিরেই ওগুলো নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখবে।'

মধুরা মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা—'

মহেশ বলল, 'গোকুলদাসজীকে কোন খবর দেবে?'

যে লোকটাকে ধীরুভাই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন তার কথা বলল মধুরা।

মহেশ জিজ্ঞেস করল, 'কে লোকটা? খোঁজ নিয়েছিলে?'

'পারি নি। সে সুযোগ ছিল না। তবে বার করে দেবার আগে ড্রইং রুমে টুমে বসে যদি ধীরুভাই তার সঙ্গে কথা বলে থাকেন, দুজনের ভয়েস টেপ-রেকর্ডারে নিশ্চয়ই ধরা আছে।'

'আর টেপরেকর্ডারগুলো যেখানে যেখানে বসানো আছে সে সব জায়গায় বসে যদি ওরা কথা বলে না থাকে?'

'তা হলে ওদের ভয়েস পাওয়া যাবে না।'

রূঢ় গলায় মহেশ বলল, 'এসব কথা তুমি গোকুলদাসজীকে বলো। হাঁ উইল বী হ্যাপি।'

মহেশ তার মতোই গোকুলদাসের কাছে কাজ করে। কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে উঁচু লেভেল থেকে কথা বলে। আগেও

অনেক বার বলেছে। মধুরা কিছু মনে করে নি। আজ ভীষণ ক্ষেপে গেল সে। প্রথমটা উত্তর দিল না। একদৃষ্টে মহেশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একসময় বলল, 'গোকুলদাসজীকে কী বলব না বলব সেটা আমি বুঝব। তোমাকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

মধুরা এভাবে জবাব দেবে, মহেশ ভাবতে পারে নি। সে গুম মেরে গেল। তার মাতব্বরির জন্য মধুরা গোকুলদাসের কাছে নালিশ করলে বিপদ হবে। কাজেই ব্যাপারটা তাকে চুপচাপ হজম করে নিতে হল। একটু চুপ করে থেকে সে বলল, 'তোমার দিক থেকে আর কিছু খবর দেবার আছে?'

'হ্যাঁ—' মাথা নেড়ে সেই নীল গগলস পরা চোখদুটোর কথা বলল মধুরা।

মহেশ চমকে উঠল, 'গোকুলদাসজীকে জানিয়ে দেব। তবে তুমি কেয়ারফুল থাকবে। আর কোন খবর?'

সোমেশের অ্যাকসিডেন্টের কথা মনে পড়ে গেল মধুরার। ধীরুভাই দেশাই এমন কিছু মারাত্মক কাণ্ড করেছে যার সঙ্গে তার এই দুর্ঘটনাটা জড়িত। খবরটা দিতে গিয়েও থেমে গেল মধুরা। কেননা একটি শয্যাশায়ী পঙ্গু যুবক তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এক গোপন পারিবারিক ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছে। তার মনে হল সোমেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ঠিক নয়। একটু চিন্তা করে সে বলল, 'না, আর কিছু নেই। গোকুলদাসজী আমাদের বাড়ির কোন খবর দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। তোমার মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' গোকুলদাসজী জানিয়েছেন, আমাকে কাল টেপরেকর্ডারগুলো দিয়ে ইচ্ছা করলে তুমি তোমার মাকে দেখে আসতে পার।'

মহেশ আর দাঁড়াল না; সামনের জুহুতারা রোডের দিকে চলে গেল। আর আইসক্রীম কিনে সোমেশের কাছে চলে এল মধুরা।

১০

মাঝরাতে পা টিপে টিপে তিন ফ্লোরের তিন ড্রইং রুম থেকে তিনটে, আর ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বার থেকে একটা, মোট চারটে টেপরেকর্ডার বার করে নিয়ে এল মধুরা। দিনের বেলা ধীরুভাই যখন তাঁর কাজকর্ম নিয়ে স্পেশাল চেম্বারে ব্যস্ত থাকবেন বা কোন প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবেন আর প্রতিভাবেন থাকবেন ছাদের পুজোর ঘরে সেই সময় লুকিয়ে ওঁদের বেডরুম থেকে শেষ টেপরেকর্ডারটা নিয়ে আসতে হবে।

চারটে টেপরেকর্ডার এনে ভাল করে দরজা আটকে আলো নিভিয়ে বিছানায় এনে খুব আস্তে সেগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে শুনতে লাগল মধুরা।

প্রথমটায় বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। ধীরুভাই বেয়ারাদের ডাকাডাকি করে এটা সেটা দিতে বলছেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। দ্বিতীয়টায় পাওয়া গেল, প্রতিভাবেন আর ধীরুভাইয়ের গলা।

প্রতিভাবেন বলছেন, 'এ কাজ তুমি ছেড়ে দাও।'

ধীরুভাই বলছেন, 'বিয়ের পর থেকেই তোমার এই ঘ্যানঘ্যানানি শুনে আসছি। তোমাকে অনেক বার বলেছি, আমার যা বিজনেস তাতে একবার ঢুকে পড়লে আর বেরুনো যায় না। তা ছাড়া—'

প্রতিভাবেন : তা ছাড়া কী ?

ধীরুভাই : তোমার অসুবিধাটা কী ? ভিলে পার্লে স্কীমে এই বিরাট বাড়ি, চারটে লিমুজিন, এত আরাম—সবই তো তোমাকে দিয়েছি। ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা, দশটা লকার বোঝাই হীরে-সোনা-চুনী-পান্নার গয়না—কী পাও নি তুমি ?

প্রতিভাবেন : চাই না, চাই না, চাই না এসব। তুমি আমাকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছ সেখানে শ্বাস নিতে পর্যন্ত কষ্ট হয়। সারাক্ষণ আতঙ্কে দমবন্ধ করে থাকি। এই বুঝি পুলিশ এল, এই বুঝি পুলিশ এল একে আর যাই

হোক, বেঁচে থাকা বলে না।

ধীরুভাই : কী চাও তুমি ?

প্রতিভাবেন : সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে; স্বাভাবিক মানুষের মতো বাঁচতে। আর চাই জঘন্য কাজকর্ম ছেড়ে তুমি সৎ পথে থাকো।

ধীরুভাই : সৎপথে থাকলে এত প্রোপার্টি, এত টাকা, এত জুয়েলারি, চাকর-বাকর, গাড়ি-টাড়ি কিছু থাকবে না। সোজা ঝোপড়পট্টি (বস্তি) কি 'চাওলে' নেমে যেতে হবে। ভিলে পার্লে স্কীমের এই পশ লোকালিটি ছেড়ে ধারাভির ঝোপড়পট্টিতে গিয়ে থাকতে পারবে ?

প্রতিভাবেন : পারব, নিশ্চয়ই পারব।

ধীরুভাই : বলতে খুব সোজা। বাজে ভ্যাজ-ভ্যাজ না করে এখন ঘুমোও।

বোঝা যায়, রাত্তিরে পাশাপাশি শুয়ে দু'জনে কথা বলছিলেন।

প্রতিভাবেন আবার বলেন : আমার কথাগুলো বাজে ভ্যাজ-ভ্যাজ ?

ধীরুভাই : নিশ্চয়ই।

প্রতিভাবেন : নিজের সংসারের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখ ? সোমেশটার কী হাল করেছ ! তোমার কৃতকর্মের জন্যে ছেলেটা কত বছর বিছানায় পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে।

ধীরুভাই চিৎকার করে ওঠেন : স্টপ, স্টপ, স্টপ। আই উইল কিল ইউ।

এরপর আর কোন কথা নেই। একটানা খানিকক্ষণ প্রতিভাবেনের ফোঁপানির শব্দ হতে থাকে। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয় টেপরেকর্ডারটায় তেমন কিছু পাওয়া গেল না। বাড়ির কাজের লোকেদের সঙ্গে মামুলি দু-চারটে কথাবার্তা ছাড়া আর কিছুই নেই এতে। চতুর্থটায় কোন শব্দটব্দ নেই। তার মানে যে ঘরে এটা রাখা ছিল ধীরুভাই বা অন্য কেউ সেখানে বসে কথাবার্তা বলেন নি।

পঞ্চমটা চালাতেই ধীরুভাইয়ের হুঙ্কার শোনা গেল : কী ভেবেছ তুমি গজানন সিন্ধে, হোল লাইফ ব্ল্যাকমেল করে আমার রক্ত শুষে যাবে !

একটা অচেনা গলা শোনা গেল। নিশ্চয়ই সেটা গজানন সিন্ধের। সে

বলল : ব্ল্যাকমেলের কথা আসছে কিসে দেশাই সাহেব! আপনার সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়েছে মাসে মাসে টাকা দেবেন। এই টাকাই তো চাইতে আসি।

ধীরুভাই : কিন্তু তুমি কনট্রাক্টের শর্ত খেলাপ করছ। তোমাকে এক হাজার টাকা করে দেবার কথা। কিন্তু এখন তুমি দেড় হাজার করে চাইছ।

গজানন : তা চাইছি। জিনিসপত্রের দাম তিন চার গুণ করে বেড়ে গেছে। আমার রেটটা তো মোটে দেড়গুণ বাড়িয়েছি। তা ছাড়া—

ধীরুভাই : তা ছাড়া কী?

গজানন : আপনার বাড়ির নিচে যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারটা করে দিয়েছি সেখানে বসে কত কোটি টাকার বে-আইনি কারবার আপনি করেন সে সম্বন্ধে আমার কাছে অনেক খবর আছে। আপনার বিজনেস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, আমি আর ক'টা টাকা বাড়তি চেয়েছি! খুশি হয়েই তো আপনার দেওয়া উচিত।

ধীরুভাই : আমি তোমাকে একটা পয়সাও বেশি দেব না। এক হাজার টাকা করে নিলে নেবে, না হলে আমার কিছু করার নেই। চার বছরে কত টাকা না খেটে আমার কাছ থেকে দুয়ে বার করেছ, একবার ভেবে দেখো।

গজানন : একটা কথা ভেবে দেখেছেন দেশাই সাহেব?

ধীরুভাই : কী কথা?

গজানন : আমি যদি আপনাকে বলি পুলিশ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আপনার বাড়ির আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারটার খবর দেব, তা হলে খুব সম্ভব দেড় হাজারটা হয়ত বাড়িয়ে আপনি দু হাজার করে দেবেন।

ধীরুভাই : তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ! গেট আউট, গেট আউট। এই বেয়ারা, কে আছ, শুয়ারের বাচ্চাটাকে গর্দান ধরে বাড়ি থেকে বার করে দাও।

গজানন : গর্দান ধরতে হবে না। আমি নিজেই বেরিয়ে যাচ্ছি। তবে খিস্তি এবং খারাপ ব্যবহারের জন্যে আপনার ফাইন হয়ে গেল। এখন আর দু

হাজারে হবে না ; তিন হাজার দিতে হবে। আপনাকে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, মানে কাল বেলা চারটে পর্যন্ত সময় দিলাম। আপনি আমার ঠিকানা জানেন। এর মধ্যে ডিসিসান জানিয়ে দেবেন। যদি তিন হাজার করে দিতে পারেন—ফাইন। না দিলে কী করব, তা আমি ঠিক করে রেখেছি।

ধীরুভাই : দারোয়ান বেয়ারা—নিকাল দো হারামীর বাচ্চাকো।

এরপর আর কোন শব্দ নেই।

দু'জনের কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল, গজানন সিন্ধে সেই মধ্যবয়সী লোকটা। একেই আজ চারটে নাগাদ ধীরুভাই দেশাই 'মেরিগোল্ড' থেকে বার করে দিয়েছেন।

আরো একটা ব্যাপার জানা গেছে, এ বাড়িতে একটা গোপন আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার আছে আর সেটা বানিয়ে দিয়েছে গজানন সিন্ধে। খুব সম্ভব গজানন একজন আর্কিটেক্ট বা কন্ট্রাক্টর কিংবা সাধারণ রাজমিস্ত্রিও হতে পারে। সে গোপনে বে-আইনি ঐ ঘর বানিয়ে মাসে মাসে ধীরুভাইয়ের রক্ত শোষণ করছে। কিন্তু ধীরুভাই আজ যেভাবে শো-ডাউন করলেন তাতে পরে মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। ওরা দু'জনে যা ইচ্ছা করুক, মধুরাকে যেভাবেই হোক মাটির তলার লুকানো চেম্বার খুঁজে বার করতেই হবে। কাল মাকে দেখে আসার পর গোটা বাড়িটা চষে ফেলবে সে।

দ্বিতীয় টেপরেকর্ডারটা থেকে জানা গেছে ধীরুভাই-এর সঙ্গে প্রতিভাবেনের সম্পর্ক আদৌ ভাল না। স্বামীর কাজকর্ম একেবারেই পছন্দ করেন না তিনি। ধীরুভাইকে সৎ পথে নিয়ে আসতে অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু নম্র শান্ত ভীরু এই মহিলা প্রবল স্বামীকে ফেরাতে পারেন নি। হয়ত ধীরুভাই সম্পর্কে তাঁর মনে এক ধরনের ঘৃণাই রয়েছে।

এক সময় টেপরেকর্ডারগুলো ওয়ার্ডরোবে পুরে তালা লাগিয়ে শুয়ে পড়ল মধুরা।

১১

পরের দিন ব্রেকফাস্টের পর সোমেশকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে গিয়ে চমকে উঠল মধুরা। প্রথম পাতাতেই গজানন সিন্ধের রক্তাক্ত মৃত-দেহের ছবি বেরিয়েছে। কাল রাত্রে কিং সার্কেল স্টেশনের গায়ে রেল লাইনের ধারের ঝাপড় পট্টিগুলোর কাছে কেউ তাকে ছুরি মেরে খুন করেছে।

রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা ধীরুভাই দেশাইর মুখ মনে পড়ে গেল মধুরার। চব্বিশ ঘণ্টার একটা আল্টিমেটাম দিয়ে গিয়েছিল গজানন সিন্ধে। কিন্তু তার অনেক আগেই এই পৃথিবী থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। বিদ্যুৎচমকের মতো মধুরার মনে হল, এই মার্ডারের সঙ্গে ধীরুভাইয়ের হয়ত কোন সম্পর্ক রয়েছে। হয়ত নয়, নিশ্চয়ই—হিমশীতল একটা স্রোত তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। এ সব খবর গোকুলদাসকে জানিয়ে দিতে হবে।

সোমেশ বলল, 'কী হল, চুপ করে আছ যে!'

মধুরা চমকে উঠে বলল, 'একটা মার্ডারের খবর বেরিয়েছে। নৃশংসভাবে লোকটাকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে।'

সোমেশ বলল, 'ও সব গ্যাস্ট্‌লি খবর পড়তে হবে না। তুমি অন্য সব নিউজ পড়।'

অন্যমনস্কর মতো কাগজ পড়ে যেতে লাগল মধুরা। কিন্তু তার চোখ ঘুরে ঘুরে বার বার গজানন সিন্ধের ডেড বডির দিকে চলে যাচ্ছে।

কাগজ টাগজ পড়ার পর কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় একটা অ্যামপুল ভেঙে সিরিঞ্জে ওষুধ ঢুকিয়ে নিল মধুরা। আজ সোমেশের ইঞ্জেকসানের দিন।

ডান হাতে ইঞ্জেকসান দেবার আধ ঘণ্টা বাদে সোমেশকে স্নান করিয়ে দিল মধুরা। তারপর নিজে স্নান করে এল। রুটিন অনুযায়ী পর পর লাঞ্চ

বিশ্রাম ইত্যাদির পর বীচে যাবার সময় সে বলল, 'প্লীজ, এক মিনিট। আমি একটু আমার ঘর থেকে আসছি।'

নিজের ঘরে এসে ওয়ার্ডরোব খুলে টেপরকর্ডারগুলো থেকে ক্যাসেট বার করতে লাগল মধুরা। কিন্তু অদ্ভুত ভূতুড়ে ব্যাপার ; চার নম্বর টেপ-রেকর্ডারের ক্যাসেটটা নেই। কাল রাত্তিরে ওটা চালিয়ে শুনেছে সে। ধীরুভাই এবং গজানন সিন্ধের ভয়েস ওটাতে রেকর্ড করা আছে। কোথায় যেতে পারে ক্যাসেটটা !'

গোটা ওয়ার্ডরোব তোলপাড় করে খুঁজল মধুরা। নেই নেই, কোথাও ক্যাসেটটা পাওয়া গেল না। কেউ কি ওটা সরিয়েছে কিন্তু সরাবে কীভাবে ? সে তো সারাক্ষণ ওয়ার্ডরোবে তালা লাগিয়েই রেখেছে, আর চাবিটা এক-মুহূর্তের জন্যও হাত ছাড়া করে নি।

পাশের ঘর থেকে সোমেশের গলা ভেসে এল, 'কী হল, এত দেরি করছ কেন ? তাড়াতাড়ি চলে এসো—'

হারানো ক্যাসেটটা সম্পর্কে এখন আর ভাবার মতো সময় নেই। মধুরা বাকী ক্যাসেট ক'টা তার ব্যাগে পুরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল তারপর দ্রুত ওয়ার্ডরোবে তালা লাগিয়ে সোমেশের ঘরে চলে এল। দেখা গেল, যে বেয়ারাটা হুইল চেয়ার ঠেলে সোমেশকে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে দেয়, সে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মিনিট কুড়ি বাদে ওদের 'বীচে' রেখে যথারীতি বেয়ারাটা 'মেরিগোল্ডে' ফিরে গেল। আর সোমেশকে নিচের বালিতে নামিয়ে মধুরা খানিকক্ষণ প্যাসিভ মুভমেণ্ট করালো কিন্তু আজও অ্যাকটিভ মুভমেণ্টটা আর করানো গেল না।

এসবের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো-টাকরা কথাও হচ্ছে।

মধুরা বলল, 'তোমার একটা পারমিসান চাই।'

সোমেশ বলল, 'কীসের ?'

'কাল সকালে আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে।' বলে সোমেশের দিকে

তাকাল মধুরা।

সোমেশের মুখে ছায়া পড়ল। সে বলল, 'কেন?'

মধুরা বলল, 'খবর পেলাম, আমার মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।' বলেই খেয়াল হল, খবরটা কীভাবে পেয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে সোমেশ। মনে মনে একটা উত্তরও তৈরি করে রাখল মধুরা।

সোমেশ কিন্তু কোন প্রশ্নই করল না। শুধু জানতে চাইল, 'বাড়িতে ক'দিন থাকবে?'

'বলতে পারছি না। মায়ের অসুখের ওপর সব নির্ভর করছে।'

'এমন একটা দরকারে যেতে চাইছ যে তোমাকে আটকে রাখা যাচ্ছে না। তবে যত তাড়াতাড়ি পার চলে এসো—'

'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে কী ভাবল সোমেশ। তারপর বলল, 'তোমাদের বাড়িতে কে কে আছে?'

প্রতিভাবেনের সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে কথা হলেও সোমেশ এ সব নিয়ে কোনদিন কিছু জিজ্ঞেস করে নি। যদিও মধুরা জানে এই শয্যাশায়ী পঙ্গু যুবকটির দিক থেকে ভয়ের কোন কারণ নেই তবু তার স্নায়ুগুলো যান্ত্রিক কোন নিয়মেই যেন সতর্ক হয়ে গেল। খুব সংক্ষেপে ছোট তিনটে ভাই-বোন আর মায়ের কথা বলল সে।

'বাবা?'

'নেই।'

'তা হলে সমস্ত ফ্যামিলি তোমার ওপর ডিপেণ্ড করে আছে?'

মধুরা চুপ করে রইল।

গভীর সহানুভূতির সুরে সোমেশ এবার বলল, 'বুঝতে পারছি, তোমার বড় কষ্ট।'

মধুরা উত্তর না দিয়ে সামান্য হাসল।

সোমেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মধুরার ভাইবোনদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কে কী করছে, পড়াশোনা করে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদিও এই যুবকটির সহানুভূতি মধুরার বুকের ভেতরকার একটা অদৃশ্য স্তরকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, গাঢ় আবেগের মতো কিছু একটা অনুভব করছে সে, তবু কোন্ প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে সে সম্বন্ধে মধুরা পুরোপুরি সজাগ। নিজের মিথ্যে আইডেনটিটি কোনভাবেই যাতে ধরা না পড়ে সে জন্য ভাসা ভাসা ভাবে সে জবাব দিয়ে যেতে লাগল। আর সোমেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার তার চোখ খানিকটা দূরে নারকেল গাছের লাইনটার দিকে চলে যাচ্ছে। নিস্পৃহ ফিলজফারের মতো আকাশ আর সমুদ্র দেখছে।

একসময় মধুরা বলল, 'আজ কী খাবে বলং—ভেলপুরী না বাটাটা পুরী?'

সোমেশ বলল, 'না। দিল্লীর চাট নিয়ে এসো; আর একটা মশলাদার বনারসী পান।'

মধুরা আর বসল না; নারকেল গাছের লাইন পেরিয়ে ওধারের ফাঁকা জায়গায় চলে গেল। একটু পর মহেশও তার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ক্যাসেটগুলো দাও।'

চারদিক ভাল করে দেখে ব্যাগ থেকে ক্যাসেট বার করে মহেশকে দিল মধুরা। গুনে নিতে নিতে মহেশ বলল, 'একি, চারটে কেন? আরো দুটো কোথায়?'

মধুরা বলল, 'একটা টেপরেকর্ডার কাজে লাগানো যায় নি।'

'আরেকটা?'

উত্তরটা আগেই ভেবে রেখেছিল মধুরা। বলল, 'ওটা ধীরুভাই দেশাইর বেডরুমে লাগানো আছে। বার করে আনার সুযোগ পাই নি। সব সময় ওখানে কেউ না কেউ ছিল।'

মহেশ বলল, 'রিস্ক না নিয়ে ভালই করেছ। পরে ওটা বার করে নিও। কবে মাকে দেখতে যাচ্ছ?'

'কাল সকালে।'

'ঠিক আছে। তার আগে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

‘গোকুলদাসজী খবর পেয়েছেন আজ রাত্তিরে ধীরুভাইয়ের সঙ্গে মিডল-ইস্টের কিছু লোক দেখা করতে আসবে। এদের সম্বন্ধে গোকুলদাসজী সব ইনফরমেসন যোগাড় করতে বলেছেন।’

‘চেষ্টা করব।’

মহেশ আর দাঁড়াল না ; বাঁ দিকে ঘুরে হলিডে ইন হোটেলের দিকে চলে গেল। আর দিল্লিওলা চাটের দোকানগুলোর দিকে পা বাড়িয়ে দিল মধুরা।

১২

সূর্যাস্তের কিছু আগে অন্য দিনের মতো আজও সোমেশকে নিয়ে 'মেরি-গোল্ডে' ফিরল মধুরা। কমপাউণ্ডের ভেতর ঢুকতেই চোখে পড়ল চার-পাঁচটা এয়ার কণ্ডিশানড ফরেন লিমুজিন 'লনে'র গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িগুলো অচেনা। এ বাড়িতে বারো চোদ্দ দিন হল এসেছে সে। কিন্তু এই ইমপোর্টেড লিমুজিনগুলো এই প্রথম দেখল। ধীরুভাই কি আবার নতুন গাড়ি কিনলেন?

সেই বেয়ারাটা ঠেলে ঠেলে সোমেশের হুইল চেয়ারটা একতলায় লিফট বক্সের কাছে নিয়ে এল। আর তখনই দেখা গেল, ওধারের বিশাল ড্রইং রুমে জোব্বাজুব্বি-পরা তিনটে আরব আর নিখুঁত ইওরোপীয়ান পোশাক-পরা দুটো লোক বসে আছে। আরবরা তো বটেই, অন্য লোক দুটোকে দেখেও বোঝা যায়, তারা ভারতীয় নয়। এদের মুখোমুখি বসে কথা বলছেন ধীরুভাই।

গোকুলদাস তা হলে ঠিক খবরই পেয়েছে। মহেশ বলেছিল, ধীরুভাইয়ের ফরেন গেস্টরা রাত্তিরে আসবে। কিন্তু তার আগেই ওরা এসে পড়েছে। এখন এদের ওপর নজর রাখতে হবে।

রোজই হুইল চেয়ারসুদ্ধু সোমেশকে লিফটের ভেতর প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় বেয়ারাটা। তারপর সে আর মধুরা ঢুকে বোতাম টিপে তেতলায় উঠে আসে।

সোজাসুজি নয়, চোখের কোণ দিয়ে ধীরুভাই এবং আরব-টারবদের দেখতে দেখতে সোমেশদের সঙ্গে লিফটে ঢুকে গেল মধুরা।

তেতলায় সোমেশের ঘরে আসার পর ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। এর মধ্যে সোমেশকে ট্যাবলেট খাওয়ানো, বই পড়ে শোনানো, ইত্যাদি কাজের

ফাঁকে ফাঁকে দোতলার রুফ গার্ডেনে তিন চার বার চলে গেছে মধুরা। এখান থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের ড্রইং রুমটা অনেকখানি দেখা যায়। অবশ্য এতদূর থেকে কারো কথাবার্তা শোনা যায় না। তবে হাত পা নাড়া এবং হাসাহাসির বহর দেখে টের পাওয়া যায়, মজার ব্যাপার চলছে। 'মেরি-গোল্ডে' আজ ভয়ানক ব্যস্ততা। বেয়ারা অনবরত ট্রেতে করে হুইস্কি রাম জিন এবং কাবাব, ফিস ফিঙ্গার, ফ্রাই ট্রাই নিয়ে নিচের ড্রইং রুমে যাচ্ছে। কিচেন থেকে নানারকম মোগলাই এবং চীনা রান্নার সুগন্ধ আসছে। বোঝা যায়, আজ রাত্তিরে ধীরুভাই-এর গেস্টরা এখানে ডিনার খাবে।

মধুরার অস্থিরতা লক্ষ্য করেছিল সোমেশ। বলল, 'বার বার উঠে যাচ্ছ কেন ? কী হয়েছে ?'

মধুরা চমকে উঠে বলল, 'কিছু না তো।'

সোমেশ এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না।

আরো খানিকক্ষণ বাদে সোমেশের সঙ্গে ডিনার খেল মধুরা। তারপর ঘণ্টা-খানেক একটা থ্রিলার পড়ে শোনাতে শোনাতেই দশটা বেজে গেল। সোমেশ বলল, 'নো মোর। আমার ঘরের আলো নিভিয়ে এবার শুতে চলে যাও।' রোজই এ সময় মধুরাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয় সে।

নিজের ঘরে এসেই শুয়ে পড়ল মধুরা। এমনিতে শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম এসে যায়। কিন্তু আজ স্নায়ুগুলো টান টান করে তাকে জেগে থাকতেই হবে।

অনেকক্ষণ পর বাইরের লাউঞ্জে যখন মিউজিক্যাল ঘড়িটায় একটা বাজল সেই সময় আস্তে আস্তে উঠে পড়ল মধুরা। যদি কাজে লাগে সে জন্য ওয়ার্ডরোব খুলে ছ নম্বর টেপরেকর্ডার বার করতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা ক্যাসেট পড়ে আছে। ছ নম্বর টেপরেকর্ডারটা খুলতে দেখা গেল, তার ভেতরেও নতুন ক্যাসেট রয়েছে। তা হলে এটা এল কোত্থেকে ? মধুরার স্পষ্ট মনে আছে, সোমেশকে নিয়ে নীচে যাবার সময় এটা এখানে ছিল না।

কী মনে হতে তাড়াতাড়ি ক্যাসেটটা একটা টেপরেকর্ডারে ঢুকিয়ে বোতাম

টিপল। সঙ্গে সঙ্গে গজানন সিন্ধে আর ধীরুভাইয়ের গলা শোনা গেল। তাড়াতাড়ি টেপরেকর্ডারটা বন্ধ করল সে। কী আশ্চর্য, এই ক্যাসেটটাই তো বিকেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু রাত বারোটায় সেটা আবার ফিরে এল কী করে? চাবি লাগানো ওয়ার্ডরোব থেকে ওটা বার করে আবার রেখে যাওয়া তো কারো পক্ষে সম্ভব না। পরক্ষণেই একটা কথা মনে হতে মাথার ভেতর ছুঁচের মতো কী যেন বিঁধে গেল। সে যেমন মোম দিয়ে ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বারের কী-হোলের ছাঁচ নিয়ে ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে নিয়েছে, সেইরকম অন্য কেউ তার ওয়ার্ডরোবের চাবিও তো বানিয়ে নিতে পারে। পারে না, নিশ্চয়ই নিয়েছে।

কিন্তু এ নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। পরে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখা যাবে। এই মুহূর্তে যেটা সব চাইতে জরুরী তা হল ছ' নম্বর টেপরেকর্ডারটা নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

অন্য ক্যাসেট-ট্যাসেট ওয়ার্ডরোবে পুরে ফের চাবি লাগাল মধুরা। তারপর একটা সরু পেন্সিল টর্চ আর ছ নম্বর টেপরেকর্ডারটা শাড়ির নিচে ঢেকে খুব আস্তে আস্তে দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়াল সে। প্যাসেজ ফাঁকা; তবে একটা মাঝারি পাওয়ারের আলো জ্বলছে সেখানে।

অন্ধকার থাকলে সুবিধা হতো। তা যখন নেই, দেয়ালের গা ঘেঁষে সন্তর্পণে এগুতে লাগল মধুরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে বাঁ দিকে যখন ঘুরতে যাবে সেই সময় একসঙ্গে এ বাড়ির সব আলো নিভে গেল।

ভিলে পার্লে স্কীমের ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ে কি কোনরকম গোলমাল হয়েছে? মধুরা বাইরের রাস্তাটাস্তা এবং চারপাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, সব জায়গায় আলো জ্বলছে। তা হলে গোলমালটা শুধু 'মেরিগোল্ডে'ই। হয়ত কোন কারণে এ বাড়ির আলোগুলো 'ফিউজ' হয়ে গেছে।

এ একরকম ভালই হল। পা টিপে টিপে মধুরা বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ পাশের ব্যালকনি থেকে নিচের 'লন'টা দেখা যায়। সেখানে রাস্তার একটু একটু আলো এসে পড়েছে। তাতেই চোখে পড়ল আরবদের সেই দামী

লিমুজিনগুলো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মানে ধীরুভাইয়ের গেস্টরা এখনও 'মেরিগোল্ডে' রয়েছে। কোথায় আছে তারা? সেটা খুঁজে বার করতে হবে।

এবার মধুরা তেতলার ড্রইং রুমের কাছে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারেও টের পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কেউ নেই। তেতলায় সবসুদ্ধ সাত খানা ঘর। ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম ছাড়া বাকী পাঁচটা ঘরের একটা সোমেশের, একটা মধুরার, একটা ধীরুভাই এবং প্রতিভাবেনের বেডরুম। ঘুরে ঘুরে তার আর সোমেশের ঘর বাদ দিয়ে অন্য ঘরগুলোর সামনে গিয়ে একবার করে দাঁড়াল মধুরা। এমন কি রুফ গার্ডেনটাও দেখে এল। ধীরুভাইদের বেডরুমটা ভেতর থেকে বন্ধ। বোঝা যায়, ওঁরা ঘুমোচ্ছেন। অন্য ঘরগুলো এবং রুফ গার্ডেন একেবারে ফাঁকা।

কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে এবার দোতলায় নেমে গেল মধুরা। এখানেও অজস্র ঘর। তার মধ্যে ধীরুভাইয়ের স্পেশাল চেম্বারও রয়েছে। তা ছাড়া আছে রুফ গার্ডেন।

সবগুলো ঘর এবং ছাদের মাথার বাগান ঘুরে ঘুরে দেখল মধুরা। এখানেও কেউ নেই।

দোতলা থেকে তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, কেউ যেন পিছু পিছু আসছে। দ্রুত ডাইনে গিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ল মধুরা।

ওধারে রুফ গার্ডেনের দিকটায় তবু রাস্তার আলোর কিছুটা আভা এসে পড়েছে কিন্তু সিঁড়িতে গাঢ় অন্ধকার। শরীরের সব শক্তি চোখে এনে দেখতে চেষ্টা করল মধুরা। আবছাভাবেও কোন মানুষের আদল চোখে পড়ছে না।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিচে নামতে লাগল মধুরা। তার ধারণা, আজ গ্রাউণ্ডফ্লোরে কিছু পাওয়া যেতে পারে। গজানন সিন্ধে এবং ধীরু-ভাইয়ের কথাবার্তার রেকর্ড থেকে জানা গেছে, এ বাড়ির তলায় একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বার রয়েছে। আণ্ডারগ্রাউণ্ড যখন, তখন সেটা একমাত্র

একতলার মাটির তলায় থাকা সম্ভব।

আগে মধুরা জানত না, রাত্তিরে এগারটা বাজার পর বাবুর্চি বেয়ারা বা অন্য কাজের লোকেদের 'মেরিগোল্ডে'র মেইন বিল্ডিং-এ থাকতে দেওয়া হয় না। বাড়ির পেছন দিকে সারভেন্টস কোয়ার্টার রয়েছে। তারা সেখানে চলে যায়। তবে ঊষার কথা আলাদা। রাত্তিরে সে তেতলায় ধীরুভাইদের বেডরুমের পাশে একটা ছোট্ট ঘরে থাকে। এ সব খবর সে কালই পেয়েছে। তবু যে পা টিপে টিপে সতর্ক ভাবে তাকে নামতে হচ্ছে তার কারণ সাবধানের মার নেই। তা ছাড়া বেয়ারা-টেয়ারারা না থাক, ধীরুভাই কোথাও ফাঁদ পেতে রেখেছেন কিনা, তাই বা কে বলতে পারে।

শেষ সিঁড়িটা থেকে সবে একতলার ড্রইং রুমের কার্পেটে মধুরা পা দিয়েছে, সেই সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ফিস-ফিস করে চাপা গলায় কারা যেন কথা বলছে। মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধকানি দশগুণ বেড়ে গেল তার। যান্ত্রিক কোন নিয়মেই যেন, পেছন দিকে পা বাড়িয়ে সিঁড়ির দুটো স্টেপ ওপরে উঠে গেল মধুরা। তারপর দেয়ালের আড়ালে সমস্ত শরীরটাকে রেখে অল্প একটু মুখ বাড়াল।

লিফটটা যে দেয়ালে, ঠিক তার উল্টোদিকের দেয়ালের কাছ থেকে চাপা গলার স্বর আসছে।

মধুরার মনে পড়ে গেল, সেদিন রাত্তিরে ড্রইং রুমে টেপরেকর্ডার বসাতে এসে ঠিক ঐ দেয়ালটার গায়েই পেন্সিল টর্চের আলো দেখেছিল সে। সেদিন ক'জন ছিল, অন্ধকারে বোঝা যায় নি। আজও যদিও কিছুই দেখা যাচ্ছে না তবু গলা শুনে মনে হচ্ছে, কম করে চার পাঁচ জন তো আছেই।

দশ সেকেণ্ডও অপেক্ষা করতে হল না, তার আগেই মেঝেতে সরু আলো জ্বলে উঠল। সেদিনের মতো আজও কেউ পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়েছে। দেখা গেল ফ্লোরের ঐ জায়গাটা থেকে কার্পেট সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা হাত মেঝেতে ছোট ফুটকির মতো একটা গর্তে সরু চাবি ঢুকিয়ে সামান্য ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গে চিচিং ফাঁকের মতো একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

মেঝেটা দু ফুটের মতো ফাঁক হয়ে গেল। অন্ধকারেও মনে হল, সেই ফাঁক দিয়ে কয়েকটা লোক নিচে নেমে গেল।

ঘটনাটা প্রায় ম্যাজিকের মতো। নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

অনেকক্ষণ শ্বাসরুদ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইল মধুরা। একবার ভাবল, নিজের ঘরে ফিরে যায়। পরক্ষণেই গোকুলদাসের মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাকে এ বাড়ির গোপন খবর না দেওয়া পর্যন্ত মুক্তি নেই। যেভাবে পোকারা নিঃশব্দে বুকে হাঁটে, প্রায় সেইভাবে এতটুকু শব্দ না করে মধুরা মেঝের সেই অংশটায় চলে গেল।

এত বড় ড্রইং রুমে কেউ কোথাও নেই। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। তবু চারদিক ভাল করে দেখে পেন্সিল টর্চ বার করে এমন ভাবে হাতের আড়াল দিয়ে জ্বালল যাতে আলোটা দূর থেকে কেউ দেখতে না পায়।

আশ্চর্য, মেঝের সেই ফাঁকটা তেমনই আছে। সেখানে টর্চ ফেলতেই চোখে পড়ল, অনেকগুলো সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। এক মুহূর্ত ভাবল মধুরা। তারপর ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। মোট কুড়িটা সিঁড়ি ভেঙে একেবারে নিচে নামতেই মাঝারি মাপের একটা ঘর চোখে পড়ল। সে যে দিকটায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে বড় বড় দুটো কাচের জানালা। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ভেন্টিলেশনের জন্য মোটা মোটা নল বসানো আছে ; সেগুলো দিয়ে হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া দুটো এয়ারকুলারও দেখা যাচ্ছে।

ঘরের ভেতরটা সোফা-টোফা দিয়ে চমৎকার সাজানো। সীলিং থেকে বাতির ঝাড় ঝুলছে। চোখের পক্ষে আরামদায়ক আলোয় ঘরটা ভরে আছে। আরো যা দেখা যাচ্ছে তা এইরকম। ধীরুভাই দেশাই জানালার দিকে মুখ করে বসে আছেন। তাঁর মুখোমুখি অর্থাৎ জানালার দিকে পিঠ রেখে বসেছে সেই তিন আরব এবং ইওরোপীয়ান পোশাক পরা দুই বিদেশী। এরা কোন্ দেশের লোক, এখনও জানা যায় নি।

গজানন সিন্ধে তা হলে মাটির তলায় এই ঘরটাই গোপনে বানিয়ে দিয়েছিল! আর এর জন্যই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে!

একটা ব্যাপারে অদ্ভুত লাগছিল মধুরার। এই মুহূর্তে গোটা 'মেরিগোল্ড' যখন অন্ধকার তখন এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে আলো জ্বলছে। তার মানে এখানে মাটির ওপর এবং নিচের জন্য আলোর আলাদা আলাদা ব্যবস্থা। মেইন সুইচও রয়েছে দুটো। ধীরুভাই এখানে আসার আগে নিশ্চয়ই ওপরের মেইন সুইচটা 'অফ' করে দিয়ে এসেছেন।

মধুরা এমনভাবে জানালার আড়ালে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল যাতে ঘরের ভেতরকার কেউ তাকে দেখতে না পায়।

ধীরুভাইরা নানারকম এলোমেলো কথাবার্তা বলছিলেন। মধুরার পক্ষে কোনটাই দরকারী বা কাজের কথা নয়। তবু যে টেপরেকর্ডারটা বুদ্ধি করে সে নিয়ে এসেছিল সেটার বোতাম টিপে চালু করে রাখল। ভাগ্যিস ওটা এনেছিল! তার বিশ্বাস আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারে যখন আরবদের নিয়ে ধীরুভাই নেমেছেন তখন জরুরী গোপন কিছু আলোচনা তাঁরা করবেনই।

যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। হঠাৎ ধীরুভাই বললেন, 'আল খালেদ সাহেব, আল মাসরিকি সাহেব, আপনারা ক'দিন আর হোটেল 'লু হেভেনে' থাকবেন ?'

দুই আরব একসঙ্গে জানালো, 'আরো দিন দশেক।'

'আপনাদের ডায়মণ্ড কোথায় নেবেন। এখানে, না কায়রোতে মেইন স্ট্রীটে আপনাদের কিউরিও শপে ?'

'কায়রোতে এবার পাঠাতে হবে না। বোম্বাইতে আমাদের লোক আছে তা তো আপনি জানেন।'

'হ্যাঁ, জানি।'

'পরশু রাতে, ধরুন এগারটা নাগাদ, সাসুন ডকের কাছে যেখানে ফিশিং হারবারটা রয়েছে সেখানে আমার লোক থাকবে। বুক পকেটে লাল গোলাপের কুঁড়ি দেখে তাকে চিনে নিতে হবে। তার হাতে ডায়মণ্ড দিলে সোজা কায়রোতে পৌঁছে যাবে।'

'অন্য সময় কীভাবে ডেলিভারি দেব ?'

'চেম্বুর রেল স্টেশনের গায়ে যে ঝোপড়পট্টি রয়েছে সেখানে নিশা আর

ডাব্বু বলে দুই মাস্তান আছে। প্লাজা মার্কেটের এক জেলে পেয়ার আছে। তারা হাজব্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়াইফ। পদ্ম রতি আর মধু। ওরাও আমাদের লোক। ওদের কাছে ডায়মণ্ড দিলে আমরা পেয়ে যাব।'

'ভেরি গুড।'

এবার তিন নম্বর আরবের দিকে তাকিয়ে ধীরুভাই বললেন, 'নাসিরি জান সাহেব, কুয়েতে আপনার কাছে কীভাবে মাল যাবে?'

নাসিরি জান বলল, 'কুয়েতে সোজাসুজি পাঠাবার দরকার নেই। আমারও এজেন্ট আছে বোম্বাইতে। নাম যোহন। জাতে গোয়ান পিদ্রু। সেঞ্চুরি বাজারের উল্টোদিকে 'প্যারাগন' বলে যে ছোট রেস্তোরাঁটা আছে, সেটা তার। যোহনের হাতে মাল দিলে আমি পেয়ে যাব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ইউরোপীয়ান পোশাক-পরা লোক দুটোর নাম মাসরিকি আর শালাম। তারা আবু ধাবির লোক। ওরা জানালো প্রতি রবিবার মধ্যরাতে ভুজ বা ধারোয়ার থেকে তাদের স্পীড বোট আবু ধাবিতে যায়। যারা ওগুলো চালিয়ে নিয়ে যায়, তাদের ধীরুভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে দেওয়া হবে। এক্স, ওয়াই আর জেড বলে ওরা ফোন করলে ধীরুভাই যেন বুঝে নেন ওরা মাসরিকিদের লোক। ওদের কাছে ডায়মণ্ড দিলে ঠিক সময়ে আবু ধাবিতে পৌঁছে যাবে।

আসল কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল। এবার ধীরুভাই বললেন, 'গলাটা আবার ভেজাবেন না। এখানেও হুইস্কি টুইস্কি সব আছে।'

পাঁচ জনই জানালো, সন্ধ্যেবেলায় মদ্যপানটা প্রচুর হয়ে গেছে। এত রাতে আর ড্রিংক করাটা ঠিক হবে না।

ধীরুভাই বললেন, 'তা হলে উঠে পড়া যাক।'

ওরা এখনই গোপন চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসবে। কাজেই আর দাঁড়িয়ে থাকাটা নিরাপদ নয়। বোতাম টিপে টেপরেকর্ডার বন্ধ করে খুব সন্তর্পণে অথচ দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ড্রইংরুমে উঠে এল মধুরা।

বাইরে আলকাতরার মতো গাঢ় অন্ধকার। আণ্ডারগ্রাউণ্ড চেম্বারের আলো

এখানে এসে পৌঁছয় নি।

গ্রাউণ্ডফ্লোরের ড্রইংরুমে কোথায় কী আছে, সব মধুরার মুখস্থ। সোফা, সেণ্টার টেবল, ফ্লাওয়ার ভাস, ইত্যাদির ভেতর দিয়ে মসৃণ গতিতে সে দোতলার সিঁড়িতে উঠে এল। হাতে সেই টেপরেকর্ডারটা।

দোতলায় সবে সে পা দিয়েছে, এই সময় মারাত্মক একটা ব্যাপার ঘটে গেল। অন্ধকারে কেউ ছোঁ মেরে তার টেপরেকর্ডারটা ছিনিয়ে নিল।

ভয়ে আতঙ্কে বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড জমাট বেঁধে গেল যেন মধুরার। কী করবে, কয়েক মুহূর্ত সে ঠিক করে উঠতে পারল না। তারপর নিজের অজান্তেই তার গলার ভেতর থেকে চাপা স্বর বেরিয়ে এল, 'কে ?'

দূর থেকে খসখসে একটা গলা ভেসে এল, 'ফ্রেণ্ড। ভয় নেই, কাল সকালেই আপনার টেপরেকর্ডার ফেরত পেয়ে যাবেন। এখন ঘরে চলে যান।'

মধুরা তবু দাঁড়িয়ে রইল। প্রাণপণে চেষ্টা করেও সে কাউকে দেখতে পেল না। পুরু নীরেট দেয়ালের মতো অন্ধকার চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে।

অচেনা অদৃশ্য লোকটা কি এত অন্ধকারেও দেখতে পায় ? সে আরো দূর থেকে আরো চাপা গলায় বলে উঠল, 'শিগগির ঘরে চলে যান। ধীরুভাইরা তাঁর গেস্টদের নিয়ে এক্ষুণি বেরিয়ে আসবেন। মেইন সুইচ জ্বেলে দিলে আপনি কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন।'

রক্তের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল মধুরার। একসঙ্গে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নিজের ঘরে শুয়ে পড়তে না পড়তেই গোটা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। ধীরুভাই দেশাই নিশ্চয়ই মেইন সুইচ 'অন' করে দিয়েছেন।

কে যে টেপরেকর্ডারটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল, একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। আতঙ্কে উদ্বেগে বাকী রাত ভাল করে ঘুমোতেই পারল না মধুরা। সমস্ত ব্যাপারটা কোন্ বিপজ্জনক দিকে চলেছে, বুঝতে না পেরে তার মাথার ভেতর আগুনের চাকার মতো অনবরত কী যেন ঘুরে যেতে লাগল।

১৩

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্টের পর মধুরা সোমেশকে বলল, 'আজ কিন্তু আমি বাড়ি যাচ্ছি।' আগেই এ ব্যাপারে ধীরুভাই এবং প্রতিভাবেনের কাছে ছুটি চেয়ে রেখেছে সে। তাঁরা তা মঞ্জুরও করেছেন।

সোমেশ বলল, 'কখন যাবে?'

'এখনই যেতে চাই।'

'ঠিক আছে। কখন ফিরবে?'

'আগে বাড়ি গিয়ে দেখি মা কেমন আছেন—'

'যত তাড়াতাড়ি পার চলে আসবে।'

'আচ্ছা—'

সোমেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে এসে মধুরা দেখল, বিছানায় ছ নম্বর টেপরেকর্ডারটা পড়ে আছে। কাল রাত্তিরে কেউ এটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এটার জন্য ভয়ানক দুর্ভাবনা ছিল তার। কিন্তু অদৃশ্য লোকটা কথা রেখেছে। আজ সকালেই খোয়ানো জিনিস ফেরত দিয়েছে সে।

দ্রুত টেপরেকর্ডারটা তুলে নিয়ে চালিয়ে দিল মধুরা। ভেতরকার ফিতে ঘুরে যেতেই লাগল, কিন্তু না, ধীরুভাই দেশাই বা তাঁর বিদেশী গেস্টদের গলা শোনা গেল না। তার মানে যে টেপরেকর্ডারটা কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল সে-ই এটা থেকে সব কণ্ঠস্বর মুছে দিয়েছে। আচমকা আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল মধুরার। মুছে দেবার আগে অজানা লোকটা ধীরুভাইদের কথাবার্তা অন্য কোন ক্যাসেটে রেকর্ড করে নেয় নি তো?

ঘণ্টাখানেক বাদে দেখা গেল, ভিলে পার্লে স্টেশন থেকে চার্চগেটের ট্রেনে উঠছে মধুরা। ভিলে পার্লে আর চার্চগেটের মাঝামাঝি জায়গায় মাহিম।

সে মাহিমে চলেছে।

মধুরা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। মোটামুটি ভিড় আছে এ কামরায় ; তবু জানলার ধার ঘেঁষে একটা বসবার জায়গা পেয়ে গেল সে।

দু'ধারের গাছপালা, বাড়িঘর, ঝোপড়পট্টি, কারখানার চোঙা এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মধুরার চোখের সামনে থেকে সে সব ঝাপসা হতে হতে একসময় মুছে যেতে লাগল। নিজের ব্যাকগ্রাউণ্ডটা এই মুহূর্তে বার বার তার মনে পড়ছে।

'মেরিগোল্ডে' নকল নামে বিপজ্জনক এক ভূমিকায় তাকে প্লে করে যেতে হচ্ছে। তার আসল নাম মধুরা পুনেকর নয়—সুজাতা কুলকার্ণি। বাবার নাম মাধবরাও কুলকার্ণি। মা উর্মিলা কুলকার্ণি। ভাইবোনেরা হল সুহাসিনী, মোহন আর রাজেশ।

সুজাতারা বেশ গরীব। আর্থিক দিক থেকে তারা মিডল ক্লাসের একেবারে তলার দিকে রয়েছে। বাবা বেঁচে থাকতে তবু একরকম চলছিল। মাধবরাও ছিলেন একটা ছোটখাটো টেক্সটাইল মিলের সামান্য ওয়ার্কার। যা মাইনে পেতেন বোম্বাইয়ের মতো বিশাল বড়লোকের শহরে তা দিয়ে দু'জনের বড় সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। মিলের ডিউটি হয়ে গেলে আরো নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করে পয়সা রোজগার করতেন।

যতদিন মাধবরাও বেঁচে ছিলেন, সংসারের কারো গায়ে আঁচ লাগতে দেন নি। তাঁর নজর ছিল উঁচু। ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া শিখে ওরা মানুষ হোক। ভাল চাকরি-বাকরি করে সুখে থাক। তাঁর মতো কষ্ট যেন ছেলেমেয়েদের না করতে হয়।

সুজাতা যখন কলেজে থার্ড ইয়ারে, সুহাসিনী ক্লাস টেনে, মোহন সিক্সে আর রাজেশ ফোরে সেই সময় হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। গোটা সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ল সুজাতার কাঁধে। কলেজ ছেড়ে চাকরির খোঁজে ব্যালার্ড এস্টেট আর ফ্লোরা ফাউণ্টেনের অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে।

কিন্তু এ শহরে যার মুরুব্বির জোর নেই তার পক্ষে একটা কাজ জোটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে ফিরোজ শা মেটা রোডের এক 'ইমপোর্ট এক্সপোর্ট' কনসার্নে হঠাৎ চাকরি পেয়ে গেল সুজাতা।

সেদিন দুপুরে ঝকঝকে অফিসটা দেখে ঢুকে পড়েছিল সে। কোনরকম আশা না নিয়েই গেছে। আশ্চর্য, বেয়ারাকে দিয়ে স্লিপ পাঠাতেই প্রোপ্রাইটরের ঘরে ডাক পড়েছিল। এয়ারকুলার বসানো, কার্পেটে-মোড়া বিশাল চেম্বারে সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উল্টোদিকে যে বসেছিল তার নাম সেই মুহূর্তে না জানলেও কিছুক্ষণ বাদেই জেনেছে। সে গোকুল-দাস আমবানি।

চমৎকার ব্যবহার করেছিল গোকুলদাস। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাড়ির যাবতীয় খবর জেনে নিয়েছিল। এবং তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা শুনে প্রচুর সহানুভূতি জানিয়েছিল। গোকুলদাস জানিয়েছে, সুজাতার জন্য কিছু একটা নিশ্চয়ই করবে।

করেও ছিল। দশ দিনের মধ্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গেছে সুজাতা। সেদিন তার মনে হয়েছে গোকুলদাস আমবানির মতো মহৎ মানুষ এই পৃথিবীতে আর একটিও নেই। কৃতজ্ঞতায় চোখে জল এসে গিয়েছিল সুজাতার।

কয়েকটা মাস বেশ ভালই কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে ভাই-বোনদের আবার স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল সুজাতা। বাবার মৃত্যুর পর সেই প্রথম বাড়ির সবার মুখে হাসি ফুটেছিল।

কিন্তু তারপরই মধুরা বুঝতে পেরেছিল, সাপের গর্তে ঢুকে পড়েছে। এখান থেকে আর বেরুবার উপায় নেই।

'ইমপোর্ট এক্সপোর্টে'র ব্যাপারটা চোখে ধুলো দেবার জন্য খাড়া করা হয়েছে। গোকুলদাসের আসল কাজ হল স্মাগলিং। ইণ্ডিয়া থেকে হীরে পাচার করে থাকে সে; মিডল ইস্ট থেকে চোরা রাস্তায় আনে গোল্ড বিস্কুট।

স্মাগলিংয়ের ব্যাপারে গোটা পৃথিবী জুড়েই বোধ হয় সেট ওয়ার্ক করে রেখেছে গোকুলদাস। তবে তার কাজের বেশির ভাগটাই মিডল ইস্টের সঙ্গে। এ ব্যাপারে দলের আরো অনেকের সঙ্গে সুজাতাকে লাগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ডায়মণ্ড স্মাগলিং-এর ব্যাপারে ধীরুভাই প্যাটেলের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে গোকুলদাস। তার ধারণা, সে যত হীরে ইণ্ডিয়া থেকে মিডল-ইস্টে পাচার করে তার বিশ গুণ করেন ধীরুভাই। কাদের সঙ্গে তার ব্যবসা, সেটা হাজার চেষ্টা করেও জানতে পারে নি গোকুলদাস। এটা জানতে পারলে সে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। নইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাকে আমৃত্যু পিছিয়ে থাকতে হবে।

অনেক চিন্তা-টিন্তা করে শেষ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা নিয়েছে গোকুলদাস। প্রথমে ধীরুভাইদের পারিবারিক যাবতীয় খবর সে যোগাড় করেছে। তারপর সুজাতাকে নার্সের ট্রেনিং দিয়ে, প্রচুর জাল সার্টিফিকেট তৈরি করে এবং তার নাম বদলে মেরিগোল্ডে পাঠিয়ে দিয়েছে। যেভাবেই হোক ধীরুভাইয়ের সমস্ত খবর তাকে বার করতেই হবে।

আসল নাম যা-ই হোক, আপাতত তাকে মধুরাই বলা হবে।

১৪

আধ ঘণ্টার মধ্যে মাহিম এসে গেল। সাবার্বন ট্রেন কোথাও আধ মিনিটের বেশি দাঁড়ায় না।

আগেই কম্পার্টমেণ্টের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল মধুরা। ট্রেন থামতেই সে নেমে পড়ল। প্যাসেঞ্জারদের ভিড় ঠেলে স্টেশন গেটের কাছে আসতেই চোখে পড়ল, রোমিও উল্টোদিক থেকে এধারেই আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে গেল মধুরা। তার মনে একটা খটকা দেখা দিয়েছে। রোমিও-ও কি তার সঙ্গে এই একই ট্রেনে ভিলে পার্লে থেকে এখানে এসেছে? সঠিকভাবে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রোমিও তাকে দেখে ফেলল। বড় বড় পা ফেলে কাছে এসে বিনীত ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'নয়া মেমসাব, আপনি এখানে!' মাহিম স্টেশনে মধুরাকে দেখে সে যেন বেশ অবাকই হয়েছে।

মধুরা সতর্ক চোখে রোমিওকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'একটু দরকারে এখানে আসতে হল। তুমিও এই ট্রেনেই এলে নাকি?'

'হ্যাঁ মেমসাব। মাহিম চার্চে আমার মানত আছে! ক্যাণ্ডেল জ্বালাতে যাব।'

'ও, আচ্ছা—'

একটু পর গেটে টিকেট জমা দিয়ে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। আর বেরিয়েই রোমিও বলল, 'আচ্ছা চলি মেমসাব। দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে এসেছি। ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে ভিলে পার্লেতে ফিরে যেতে হবে। নমস্তে।' বলে আর দাঁড়াল না; ওধারের ওভার ব্রিজটার দিকে চলে গেল।

রোমিও যেদিকে গেছে, অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল মধুরা। রোমিও যখন ওভারব্রিজে উঠে মানুষের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই সময় ডাইনে

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সে। এখানে থেকে কম করে আধ মাইল হাঁটতে হবে তাকে।

এগারটা নাগাদ নিজেদের 'চাওলে' পৌঁছে গেল মধুরা।

'চাওল' হচ্ছে লম্বা ব্যারাক টাইপের বাড়ি। একেকটা ঘর নিয়ে একেকটা ফ্যামিলি এখানে থাকে। নানা জাতের সব মানুষ। বাঙালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, গোয়ান পিক্রু, সাউথ ইণ্ডিয়ান। ভারতবর্ষের এমন কোন জাত নেই যা এখানে পাওয়া যাবে না। তাদের এই 'চাওল'টাকে মধুরার একেক সময় 'মিনি ইণ্ডিয়া' মনে হয়।

তাদের 'চাওল'টার মাথায় ছাদ থাকলেও এটা একটা ভাল জাতের বস্তি। এরই দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে একখানা কামরায় মধুরারা থাকে। অবশ্য ঘরটার পেছনে একফালি রান্নাঘর এবং সামান্য একটু স্নানের জায়গা রয়েছে।

মধুরা নিজেদের ঘরে পৌঁছে দেখল, ভাইবোনরা সবাই আছে। একধারে মা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায় ভীষণ অসুস্থ। হাতের ব্যাগটা একপাশে রেখে মধুরা মায়ের পাশে গিয়ে বসল।

তার মা অর্থাৎ উর্মিলা দুর্বল দুর্বল গলায় বলল, 'এসেছিস ডলি!' মধুরার আদরের নাম ডলি।

'হ্যাঁ মা, তুমি এখন কেমন আছ?' বলে উর্মিলার কপালে হাত রাখল মধুরা, 'এ কি, এখনও তো তোমার বেশ জ্বর।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে। পাঁচ দিন আগে তোর অফিসে রাজুকে দিয়ে খবর পাঠালাম। এত দিনে তোর আসার সময় হল!'

মায়ের চোখে মুখে এবং গলার স্বরে গভীর অভিমান। মধুরা বলল, 'জরুরী একটা কাজ ছিল। সে জন্যে আসতে দেরি হল।'

উর্মিলা বলল, 'তোর অফিস থেকে রাজুকে বলল, তুই নাকি বরোদায় গেছিস।'

মায়ের কাছে মিথ্যে বলতে কষ্ট হচ্ছিল মধুরার। বাড়ির সবাই জানে

'ইমপোর্ট এক্সপোর্ট' কোম্পানিতে সে চাকরি করে। কিন্তু তার আসল কাজটা যে কী সে সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই নেই। আস্তে করে সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'দশ পনের দিন পর পরই তোর অফিস তোকে বাইরে পাঠায়। আমার ভীষণ ভয় করে ডলি!'

উর্মিলা বেশি লেখাপড়া না জানলেও প্রখর বুদ্ধিমতী। মধুরা যে চাকরিটা করছে সে সম্বন্ধে তার মনে কোথাও একটা সংশয় দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে মধুরার আগেও অনেক কথা হয়েছে। যে কৈফিয়ৎ অনেকবার সে দিয়েছে, সেটাই আবার নতুন করে দিল, 'ভয়ের কী আছে মা! সবার কাজ কি একরকম। আমার ট্যুরের চাকরি। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে অর্ডার যোগাড় করতে হয়।'

বিষণ্ণ মুখে উর্মিলা বলল, 'কী জানি, কিছুই বুঝতে পারি না। এত ঘোরা-ঘুরির কাজ না করে অন্য কোন চাকরি যদি যোগাড় করতে পারিস—তাই দেখ।'

'বি-এ টাও পাস করতে পারি নি। এই চাকরি ছাড়লে অন্য চাকরি কোথায় পাব? আমাদের উপোস দিয়ে মরতে হবে।'

উর্মিলা আর কিছু বলে না। তার বুকের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। বোঝা যায়, তার উৎকণ্ঠা বিন্দুমাত্র কমেনি।

মধুরা প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য দ্রুত ভাইবোনদের দিকে ফেরে। ছোট বোন সুহাসিনী মেঝেতে বসে ছুরি দিয়ে আলু কাটছে। দুই ভাই মোহন এবং রাজেশ চুপচাপ মধুরার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের চারপাশে বইপত্র ছড়ানো। বোঝা যায়, খানিকক্ষণ আগে ওরা পড়ছিল। লেখাপড়ায় ওরা খুবই ভাল। তা ছাড়া স্বভাবও চমৎকার—যেমন শান্ত তেমনি বাধ্য।

মধুরা বলে, 'কি রে, তোরা আজ স্কুলে যাস নি যে?' সুহাসিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর কলেজ বন্ধ নাকি?'

তিন ভাইবোনই জানায়, মুসলমানদের পরব উপলক্ষে আজ সব স্কুল কলেজ বন্ধ। তবে ক'দিন ধরে রাজেশ মোহন স্কুলে গেলেও, মায়ের অসুখের জন্য

সুহাসিনী কলেজে যেতে পারছে না। সে বেরুলে একা ঘরে মাকে কে দেখবে ?

মধুরা সুহাসিনীকে বলল, 'কলেজে না গিয়ে ভালই করেছিস। মাকে ডাক্তার দেখিয়েছিস ?'

সুহাসিনী মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কোন্ ডাক্তার ?'

'ডাক্তার শিরোদকার। ঐ যে রাস্তার মোড়ের কাছে যার ডিসপেন্সারি।'

'কি বললে ডাক্তার ?'

'ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। শরীর খুব দুর্বল। বিছানায় কম করে দশ দিন শুয়ে থাকতে বলেছে।'

'কী ওষুধ দিয়েছে ?'

'ক্যাপসিউল। ঐ তো টেবিলের ওপর রয়েছে। কাল পর্যন্ত ইঞ্জেকসান চলেছে। ডাক্তার বলেছে, ক্যাপসিউলটা আরো দশ দিন চালাতে হবে।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে জায়গা কম বলে মাধবরাও বেঁচে থাকতে থাকতে সেলো কাঠের দুটো তেতলা খাট বানিয়ে নিয়েছিলেন। একেবারে নিচের তলায় থাকে হাঁড়ি-কুড়ি, বাক্স-সুটকেশ এবং সংসারের নানা টুকিটাকি জিনিস। ওপরের দুটো তলায় শোবার ব্যবস্থা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মধুরা যখন একটু বিশ্রামের জন্য বাঁ দিকের খাটের দোতলায় উঠতে যাবে, সেই সময় সুহাসিনী তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল, 'দিদি, একটু বাইরে চল। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

মধুরাদের ঘরের সামনে দিয়ে টানা বারান্দা চলে গেছে। বারান্দার এক দিকে সারি সারি চল্লিশটা ঘর।

এই দুপুরবেলায় বারান্দাটা প্রায় ফাঁকা। যে দু'একজনকে দেখা যাচ্ছে তারা বেশ খানিকটা দূরে।

বারান্দায় এসে সুহাসিনী চাপা গলায় বলল, 'একটা সত্যি কথা বলবি দিদি ?'

সুহাসিনীর বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু আছে যাতে চমকে উঠল মধুরা। সে বলল, 'কী কথা ?'

'তুই কি অফিসের কাজে সত্যি সত্যি বরোদা গিয়েছিলি ?'

তক্ষুনি উত্তর দিতে পারল না মধুরা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হঠাৎ এরকম একটা কথা তোর মনে হল ?'

সুহাসিনী বলল, 'আমার এক বন্ধু পরশু বিকেলে জহু বীচের ওদিকটায় মানে 'সান অ্যাণ্ড স্যাণ্ড' বীচের তলায় তোকে দেখেছে। তোর সঙ্গে হুইল চেয়ারে একটা ভারি সুন্দর চেহারার ছেলে নাকি ছিল।'

গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে মধুরা বলল, 'এসব কথা মাকে বলেছিস ?'

'না। বললে ভেবে ভেবে মা মরেই যাবে। এমনিতে তোকে নিয়ে মায়ের ভীষণ দুশ্চিন্তা।'

'আর কাউকে বলিস নি তো ?'

'না।'

'বলার দরকার নেই। একদম চুপচাপ থাকবি।'

'দিদি, তুই কি কোন গোলমালে পড়ে গেছিস !'

মধুরা হাসতে চেষ্টা করল। সুহাসিনীর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আরে না না, তোকে আমি পরে সব বুঝিয়ে দেব। এখন কিছু জানতে চাস না।'

সুহাসিনী খুব একটা ভরসা পেল না। কাঁপা গলায় বলল, 'আমার ভীষণ ভয় করছে রে দিদি।'

'কোন ভয় নেই। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে। চল, ঘরে যাই।' বোনের কাঁধে হাত রেখে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল মধুরা।

বিকেলে মালতী ভোঁসলে এল। তাকে মাহিমের এই 'চাওলে' দেখবে, মধুরা ভাবতে পারে নি। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার,

আপনি !'

মালতী হেসে হেসে বলল, 'একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমরা বন্ধু। হঠাৎ 'আপনি' করে বলছ যে!'

মধুরা বুঝল, এখানেও মালতী বন্ধুর ভূমিকায় প্লে করতে এসেছে। স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সে। বলল, 'আরে তাই তো, তাই তো। আমার মা আর ভাইবোনদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' এ বাড়ির ঠিকানা মালতী কোথায় পেয়েছে সেটা আর জিজ্ঞেস করল না। কার কাছে সেটা পাওয়া সম্ভব, মধুরা তা জানে।

পরিচয় এবং চায়ের পালা শেষ হলে মালতী বলল, 'চল, তোমাদের এলাকাটা একটু ঘুরে দেখি। আগে আর কখনও এদিকে আসি নি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল মধুরা। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল না।'

বাইরে আসতেই মালতী বলল, 'গোকুলদাসজী তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'সেটুকু বুঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে। কী জানতে চাও বল—'

'মিডল-ইস্টের লোকগুলো সম্বন্ধে কিছু খবর যোগাড় করতে পারলে? সেটা জানার জন্যে গোকুলদাসজী অস্থির হয়ে আছেন।'

এক মুহূর্ত ভাবল মধুরা। অন্ধকারে অদৃশ্য কেউ টেপরেকর্ডার ছিনিয়ে নিয়ে ধীরুভাই আর আরবদের কথাবার্তা মুছে ক্যাসেট ফেরত দিয়ে গেছে; এমন কথা বললে মধুরাকে হাজার রকম কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মিডল-ইস্টের লোকগুলো তাদের এজেন্টদের নাম বলেছে এবং কীভাবে কোথায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তা-ও ধীরুভাইকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অত নাম তার মনে নেই। উল্টোপাল্টা নাম বললে গোকুলদাস ক্ষেপে যাবেন। তার চেয়ে এ ব্যাপারে অস্বীকার করাই ভাল। মধুরা বলল, 'চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোন খবর যোগাড় করতে পারি নি।'

মালতী বলল, 'যেভাবেই হোক ওদের ব্যাপারে সব জানতে হবে।'

'মেরিগোল্ডে ফিরে গিয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করব।'

'কবে ফিরে যাচ্ছ?'

'মায়ের অসুখটা একটু কমলেই।'

'আরবরা কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।'

'ওরা যাবার আগেই আমি ভিলে পার্লেতে হাজির হয়ে যাব।'

'ঠিক আছে। আমি তা হলে চলি।'

'আচ্ছা।'

মালতী ভোঁসলে আর মধুরাদের 'চাওলে' এল না। সোজা সামনের রাস্তা ধরে স্টেশনের দিকে চলে গেল।

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে মধুরা ভাবল, 'মেরিগোল্ডে' গিয়ে ধীরুভাই এবং মিডল-ইস্টের লোকগুলোর গলার স্বর আরেক বার 'টেপ' করতে চেষ্টা করবে। সেখানে আরো একটা কাজ আছে তার। অন্ধকারে যে টেপ-রেকর্ডার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাকে খুঁজে বার করবে। নিজেকে আড়ালে রেখে লোকটা তার ওপর নজর রেখেছে ঠিকই কিন্তু তার এতটুকু ক্ষতি করে নি। উল্টে জানিয়েছে সে তার বন্ধু ? অদৃশ্য এই বন্ধুটি কে ?

১৫

ছুদিন পর 'মেরিগোল্ডে' ফিরে এল মধুরা। মায়ের জ্বর আর নেই ; অনেকখানি সুস্থই হয়ে উঠেছে সে।

এই ছুদিনে সুহাসিনীকে কিছুই করতে দেয় নি মধুরা। মাকে ওষুধ খাওয়ানো, গা স্পঞ্জ করে দেওয়া থেকে রান্নাবান্না, ভাইবোনদের যত্ন করা —সবই নিজের হাতে করে গেছে সে। নানা কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে একটি অসহায় পঙ্গু যুবকের মুখ বার বার তার মনে পড়েছে। ধীরুভাই দেশাইদের চরম ক্ষতির উদ্দেশ্য নিয়েই মেরিগোল্ডে ঢুকেছিল সে। ভেবেছিল, লুকিয়ে লুকিয়ে এখানকার যাবতীয় গোপন খবর যোগাড় করে গোকুলদাসের হাতে তুলে দিয়ে একদিন চুপচাপ চলে যাবে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ানো, ম্যাসাজ করা, বাঁচে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া—প্রতিদিনের এই সব রুটিন কাজের মধ্যে কখন যে সোমেশ তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, আগে টের পাওয়া যায় নি। মাহিমে মা এবং এতগুলো ভাইবোনের মধ্যে ছিল মধুরা ; সংসারের প্রচুর কাজও করেছে। তবু অনবরত তার মনে হয়েছে, অনেক কিছুই করা হয় নি। মাত্র কয়েক দিনে সোমেশ তার প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাকে ছেড়ে এসে ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল।

'মেরিগোল্ডে'র গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই মধুরার চোখে পড়ল 'লনে'র গায়ে সেই দামী এয়ার-কণ্ডিশান্‌ড্‌ লিমুজিনগুলো লাইন দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে। তার মানে মিডল-ইস্টের লোকগুলো এখনও এ বাড়িতেই আছে।

গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে আসতেই দেখা গেল, সুবিশাল ড্রইং রুমের এক ধারে বসে ধীরুভাই দেশাই তাঁর মধ্যপ্রাচ্যের বন্ধুদের সঙ্গে

গল্প করছেন।

চোখের কোণ দিয়ে এক পলক ওদের দিকে তাকিয়েই মধুরা লিফ্‌টে করে তেতলায় উঠে সোজা সোমেশের ঘরে চলে এল।

সোমেশ কাচের জানালার বাইরে উদাসীন ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল। মধুরার দিকে ফিরে বলল, 'বলে গেলে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। ফিরলে এক মাস বাদে। আমার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে, তাই না!'

মধুরা বলল, 'এক মাস কোথায়! মোটে তো দুটো দিন।'

'না, এক মাস।'

সোমেশের ছেলেমানুষিতে হেসে ফেলল মধুরা। বলল, 'আচ্ছা, এক মাসই। তুমি কেমন আছ, বল—'

সোমেশ বলল, 'খুব খারাপ।'

বোঝা যাচ্ছে, সোমেশ অভিমান করে আছে। মধুরা বলল, 'কী করব বল। মায়ের জ্বরটা না কমলে কি আসতে পারি!' একটু থেমে আবার বলল, 'ঠিক সময়ে ওষুধ টোষুধ খেয়েছিলে?'

'না। কেন খাব?'

ঠিক হয়েছিল, মধুরা যে ক'দিন থাকবে না, সেইসময় ঊষা তাকে ওষুধ খাওয়াবে, ম্যাসাজ করে দেবে, অ্যাকটিভ আর প্যাসিভ মুভমেণ্ট করাবে। কী ভাবে এই মুভমেণ্টগুলো করাতে হয়, সব দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল মধুরা। তবে রে বা ইঞ্জেকশানটা ঊষা দেবে না; সেগুলো দেবেন ডাক্তার দস্তুর। তবে বীচে বেড়ানো বন্ধ থাকবে। ধীরুভাই এবং প্রতিভাবেন তাকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে সোমেশকে সমুদ্রের ধারে পাঠাবেন না।

মধুরা বলল, 'খাও নি কেন?'

সোমেশ বলল, 'আমার ইচ্ছে।'

এই সময় ঊষা এসে ঘরে ঢুকল। মধুরাকে দেখে বলল, 'আপনি এসেছেন; আমি বাঁচলাম সিস্টার মেমসাব। ছোটাসাবকে এ দু'দিন ওষুধ খাওয়াতে পারি নি। খাওয়াবার কথা বললে হাতের কাছে যা পেয়েছেন আমাকে ছুঁড়ে মেরেছেন।'

সোমেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'গেট আউট, গেট আউট। তোকে আমি খুন করে ফেলব।'

হাতের ইশারায় উষাকে ঘর থেকে যেতে বলে মধুরা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল। ন'টা প্রায় বাজে। এখন সোমেশের একটা ক্যাপসিউল খাবার সময়। বলল, 'ঠিক আছে, আমি তো এসে গেছি। এবার খাও।'

'না, খাব না।'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত ক্যাপসিউলটা খাওয়াতে পারল মধুরা। তারপর বলল, 'পাঁচ মিনিট একটু একা থাকো। আমি রাস্তার শাড়িটা চেঞ্জ করে আসি।'

সোমেশ উত্তর দিল না।

মধুরা তার অনেক কাছে এসে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'প্লীজ—'

নিস্পৃহ গলায় সোমেশ বলল, 'যেতে পারো।'

শাড়ি পাল্টে ফিরে এসে মধুরা দেখল, সোমেশের মুখচোখের চেহারা একেবারেই বদলে গেছে। রাগ অভিমান, কিছুই নেই। বরং খুশিতে সে ঝলমল করছে। খুশিটা যে তারই জন্য, সেটা বুঝতে পারল মধুরা। শিশুর মতো সরল, অভিমানী এবং অত্যন্ত টেম্পারামেণ্টাল এই যুবকটির জন্য ভারি মায়া হতে থাকে তার।

সোমেশ বলল, 'চেয়ারটা টেনে কাছে এসে বসো।'

মধুরা তার কথামতো বসল।

সোমেশ বলল, 'তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

'কী কথা ?' মধুরা সোমেশের চোখের দিকে তাকায়।

'একটু ভাবো না।'

'কিছু বুঝতে পারছি না।'

'তুমি তো দু'দিন ছিলে না। এর মধ্যে ভেবে দেখলাম, তোমাকে ছাড়া আমার আর চলবে না। তোমাকে পার্মানেণ্টলি এখানে ধরে রাখতে হবে।'

'যতদিন না তুমি দাঁড়াতে পারছ, আমি তো এখানে থাকবই।'

'যদি কোনদিন দাঁড়াতেও পারি, তার পরও তোমাকে থাকতে হবে। মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে। মা-ও তাতে রাজী।'

'কিন্তু—'

'বুঝতে পারছ না তো—' বলে একটু হাসল সোমেশ।

'না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল মধুরা।

'তক্ষুনি উত্তর দিল না সোমেশ। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখ কুঁচকে হাসতে লাগল। তারপর একসময় বলল, 'পার্মানেণ্টলি ধরে রাখার একটাই রাস্তা আছে। সেটা হল বিয়ে—'

'বিয়ে!' মধুরা চমকে উঠল। এক মুহূর্ত আগেও এমন একটা কথা তার বহুদূর কল্পনাতেও ছিল না। সোমেশদের চরম সর্বনাশ করতেই নকল পরিচয়ে 'মেরিগোল্ডে' তার আসা। তার মতো ঠক ফেরেববাজ মারাত্মক মেয়েকে কারো বিয়ে করার কথা ভাবাও উচিত না। সোমেশের কোন-রকম ক্ষতি সে করতে পারবে না। চাপা গলায় মধুরা বলল, 'না না, এ হয় না।'

আচমকা আলো নিভে গেলে যেমন হয় সোমেশের মুখটা অবিকল সেই-রকম হয়ে গেল। বিষণ্ণ গলায় সে বলল, 'জানি আমি পঙ্গু, ফিজিক্যাল ডিসেবেল্ড্; আমার এরকম স্বপ্ন দেখাই অন্যায় হয়েছে।'

মধুরা দু হাত নেড়ে বিপন্ন মুখে বলল, 'না না, আমি ওসব ভাবিই নি।'

'তবে কী ভেবেছ?'

'আমরা বড় গরীব।'

'ও, এই কথা। ও ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। মা শিগগিরই গিয়ে একদিন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

মধুরা শিউরে উঠল। প্রতিভাবেন যদি সত্যি সত্যি যান, তাঁকে যেতে হবে সাত বাংলায়। কেননা সেখানকার ঠিকানাই দিয়েছে সে। সাত বাংলায় যাওয়া মাত্র ধরা পড়ে যাবে, মধুরা নকল ঠিকানা দিয়েছে। সে নিজেও যে জাল, সেটাও গোপন থাকবে না।

মধুরা বলল, 'না না, এখন তোমার মাকে যেতে বারণ কর। আমার অনেক

দায়দায়িত্ব। ভাইবোনেদের মানুষ করা, বোনের বিয়ে, ভাইদের চাকরি— এসব না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কিছুই ভাবতে পারি না।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলবে তখনই মাকে পাঠাব। ততদিন আমি অপেক্ষা করব।'

মধুরা কিছু বলল না। মনে মনে সে ভাবল, যত তাড়াতাড়ি হয়, এখান থেকে তাকে চলে যেতে হবে।

১৬

দিন তিনেক কেটে গেল।

সেই যে মধুরা ভেবে রেখেছিল 'মেরিগোল্ড' থেকে চলে যাবে ; শেষ পর্যন্ত কিন্তু যাওয়াটা হয়ে ওঠে নি। প্রথমত, ভাবামাত্রই এখান থেকে বেরুনো সম্ভব না। যতক্ষণ না গোকুলদাসের কাছ থেকে কোনরকম নির্দেশ আসছে, তাকে এখানে থাকতেই হবে। তা ছাড়া বেরুবার কথা ভাবলেই একটি বড় অভিমানী, বড় সরল আর পঙ্গু এবং টেম্পারামেন্টাল যুবকের মুখ চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

এ তো গেল তার আর সোমেশের ব্যাপার। অন্য দিকে যা যা হচ্ছে সেগুলো এরকম। মিডল-ইস্টের সেই লোকগুলো এখন আর এ বাড়িতে থাকে না—হোটেলে চলে গেছে। তবে রোজই বিকেলের দিকে একবার করে এসে মাঝরাতে ফিরে যায়। তাদের কথাবার্তা রেকর্ড করা বা তাদের খবর যোগাড় করা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ মধুরার নেই। অবশ্য মহেশ রোজই তাদের সম্বন্ধে জানতে চাইছে। আর কীরকম সন্দেহ হয়েছে, এ ব্যাপারটায় ঢিলেমি দিয়েছে মধুরা। এর ফলাফল যে ভাল হবে না এবং গোকুলদাস যে ক্রমশ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছেন, সে সব জানাতেও ভোলে নি সে। তা সত্ত্বেও কেন যে আরবদের সম্পর্কে সে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে, মধুরা বুঝতে পারে না।

এদিকে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সে। মাহিম থেকে ফেরার পর

নীল চশমা পরা সেই চোখদুটো আর দেখা যাচ্ছে না।

আজ বিকেলে সোমেশকে নিয়ে রুটিন অনুযায়ী 'বীচে' এসেছে মধুরা। হুইল চেয়ার থেকে তাকে বালিতে নামিয়ে প্রথমে সে প্যাসিভ মুভমেণ্ট করিয়েছে। এখন অ্যাকটিভ মুভমেণ্টের পালা।

'বীচে' আসার পর রোজ যান্ত্রিক কোন পদ্ধতিতে নারকেল গাছের লাইনটার দিকে চোখ চলে যায় মধুরার। অনিবার্য নিয়মের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে মহেশ। আজ কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছে না। কী হল মহেশের ? এত দেরি করছে কেন সে ? তার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই জানার উপায় নেই।

বীচের এদিকটা রোজই প্রায় ফাঁকা থাকে। দূরে কিছু লোকজন দেখা যাচ্ছে।

মহেশের ভাবনটা মাথা থেকে বার করে মধুরা সোমেশকে বলল, 'ডান পা'টা নাড়তে চেষ্টা কর।'

সোমেশ প্রাণপণে পা তুলতে চাইল ; পারল না। ক্লান্ত গলায় বলল, 'না, আজও হল না।' একটু থেমে আবার বলল, 'বাবা আমাকে সারা জীবনের মতো শেষ করে দিয়ে গেছে।'

মধুরা বলল, 'রোজই শুনি, তোমার বাবা তোমাকে শেষ করে দিয়েছেন। কিন্তু কীভাবে করেছেন, সেটা বল না। সেটা না জানলে তোমাকে দাঁড় করাব কী করে ?' বলতে বলতে হঠাৎ তার মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো কিছু খেলে গেল। নিচু গলায় এবার সে বলল, 'আমারও তো ইচ্ছে করে, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সে নীরোগ সুস্থ একটা মানুষ হবে।'

সোমেশের মুখে গাঢ় বিষাদের ছায়া পড়ল। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'ঠিক বলেছ। বাবার সেই ব্যাপারটা আজ তোমাকে বলব। তবে একটা কথা দিতে হবে।'

'কী কথা ?'

'সেই ঘটনাটা মা, বাবা আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তুমিও কাউকে তা বলবে না। জানাজানি হলে বাবার ফাঁসি হয়ে যাবে। মা আর

আমিও শেষ হয়ে যাব। বাবাকে যতই ঘৃণা করি না কেন, তাকে ভালও তো বাসি।'

মধুরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল, কিছু বলল না।

সোমেশ এবার যা বলল তা এইরকম। তার বাবা ধীরুভাই দেশাই ইণ্ডিয়ার এক নম্বর ডায়মণ্ড স্মাগলার। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর স্মাগলিং-এর নেট ওয়ার্ক।

সোমেশের বয়স যখন বারো তখন তারা প্যারেলে থাকত। সেই সময় একদিন রাত্রে দলের একটা লোকের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। ঝগড়ার কারণ অবশ্য বলতে পারবে না সোমেশ। যাই হোক, হঠাৎ রাগের মাথায় বাবা লোকটাকে গুলি করে বসে এবং তক্ষুনি সে মারা যায়।

সে রাত্রেই ডেড-বডি সরিয়ে রক্ত ধুয়ে বাড়ি পরিষ্কার করে ফেলেন ধীরু-ভাই। কীভাবে খুনের ব্যাপারটা চাপা দিয়েছিলেন, সোমেশ বলতে পারবে না।

সেদিন রাত্তিরের কথা স্পষ্ট মনে আছে। বাবা আর সেই লোকটার চেঁচা-মেচির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সোমেশের। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাবার ঘরের কাছে গিয়ে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখে ফেলে সে। তারপর আতঙ্কে দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে যায়। তারপর থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। এই ভাবে পনের ষোল বছর কেটে গেছে।

রুদ্ধশ্বাসে পুরো ঘটনাটা বলে চুপ করল সোমেশ। মধুরাও কিছু বলল না। শুধু আরব সাগরের উল্টোপাল্টা দুরন্ত হাওয়া শোঁ শোঁ আওয়াজ তুলে নারকেল গাছের মাথায় অনবরত ভেঙে পড়তে লাগল।

কতক্ষণ তারা চুপচাপ বসে ছিল, মনে নেই। হঠাৎ কোথায় যেন চাপা শিস দেওয়ার মতো শব্দ হল।

শব্দটা মধুরার চেনা। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে সে দেখল, খানিকটা দূরে মহেশ কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠিক পেছনে আরো জন চারেক। সবাইকে চেনে মধুরা। রবার্টো, ডিসুজা, রেবেলো আর গণপতি। এরা

গোকুলদাসের অ্যাকসান উইংএর লোক। অত্যন্ত বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক। হাসতে হাসতে যে কোন মুহূর্তে পেটে ছুরি বসিয়ে দিতে পারে।

চোখাচোখি হতেই মহেশ হাতের ইশারায় মধুরাকে ডাকল। মধুরা উঠে দাঁড়াল কিন্তু গেল না।

মহেশ চাপা তীব্র গলায় বলল, 'কাম অন—'

মধুরা এক পা এক পা করে খানিকটা এগেয়ে গেল। বলল, 'কী চাও তোমরা?'

'গোকুলদাসজী আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে বলেছেন।'

'কেন?'

'গোকুলদাসজীকেই তা জিজ্ঞেস করো।'

'আমি এখন যেতে পারব না। পরে গোকুলদাসজীর সঙ্গে দেখা করব।'

'এই কথাটাই তুমি বলবে, গোকুলদাসজী বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আমার সঙ্গে ওদেরও পাঠিয়ে দিয়েছেন।' বলে নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে দিল মহেশ।

মধুরা মহেশদের ভাল করে একবার দেখল। সবার মুখ পাথরের মতো শক্ত; চোখের তারা স্থির। তার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলল, 'আমার এখন কাজ আছে।'

'কাজ মানে তো 'বীচে' বসে ল্যাংড়ার সঙ্গে প্রেম করবে। তোমাকে প্রেম করার জন্যে এখানে পাঠানো হয় নি। চল, হারি আপ—'

দ্রুত একবার ঘাড় ফিরিয়ে সোমেশকে দেখল মধুরা। এখান থেকে তার বা মহেশের কথা সোমেশ শুনতে পাচ্ছে না। তবে তার চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়েছে।

হঠাৎ মধুরার কী হল, কে জানে। সে বলল, 'বললামই তো, আমি এখন যাব না।'

'তোমার বাপ যাবে—' বলেই কোমরের কাছ থেকে একটা রিভলবার বার করে মধুরার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, 'চল। কুইক। গলা দিয়ে একদম আওয়াজ বার করবে না।'

রিভলবারটা দেখতে পেয়েছিল সোমেশ। সে চিৎকার করে উঠল, 'এই, এই কী হচ্ছে?'

মহেশরা ফিরেও তাকাল না। মধুরাকে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চলল।

এদিকে নিজের অজান্তেই শরীরের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল সোমেশের। গলার শির ছিঁড়ে সে চিৎকার করতে লাগল, 'কে আছ, কে আছ—হেল্প হেল্প—ধর ওদের, ধর।' চেঁচাতে চেঁচাতেই অসহনীয় এক উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল।

ওধারে ভেলপুরী বাটাটাপুরী দোকানগুলোতে যে সব লোকজন ছিল, তারা চিৎকার শুনে দৌড়ে আসতে লাগল।

এত লোক দেখে ঘাবড়ে গেল মহেশরা। মধুরাকে ছেড়ে তারা 'বীচে'র বাঁ দিক ধরে পালিয়ে গেল।

লোকগুলোই মধুরাকে সোমেশের কাছে নিয়ে এল। সে তখন কাঁপছিল।

সোমেশ জিজ্ঞেস করল, 'ওই বদমাসগুলো কারা?'

উত্তর দিতে গিয়ে দারুণ এক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ মধুরার গলায় স্বর ফুটল না। তারপর সে বলল, 'এ কি, তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ!'

এতক্ষণ সোমেশরও খেয়াল হয় নি। এবার নিজের দিকে তাকিয়ে খুশিতে বিস্ময়ে সে উন্মাদের মতো চেঁচাতে লাগল, 'আমি দাঁড়াতে পেরেছি, আমি দাঁড়াতে পেরেছি!' অজস্র মানুষের সামনেই দু হাতে মধুরাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'সব তোমার জন্যে, সব তোমার জন্যে।'

আধ ঘণ্টা বাদে হুইল চেয়ারে 'মেরিগোল্ডে'র গেট পর্যন্ত এসে বাকি রাস্তাটা হেঁটে ভেতরে ঢুকল সোমেশ।

পনের বছর পর তাকে হাঁটতে দেখে গোটা বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে গেল। ধীরুভাই ঘোষণা করলেন এই উপলক্ষে একটা বিরাট পার্টি দেবেন।

আনন্দ-টানন্দ যখন পুরোদমে চলছে, সেই সময় মালতী ভোঁসলে এসে

মধুরার কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'কাল দশটার ভেতর গোকুলদাসজীর সঙ্গে অবশ্যই তাঁর অফিসে দেখা করবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আর যদি দেখা না করো তোমার মা ভাইবোনদের প্রোটেকসান দেবার কিন্তু কেউ নেই।'

১৭

পর দিন ভোরে নিজের হ্যাণ্ড-ব্যাগে টেপরেকর্ডার-টেকর্ডারগুলো পুরে পা টিপে টিপে নিচে এল মধুরা। এখনও এ বাড়ির কেউ জাগে নি। তবে গেটে দারোয়ানটা ঠিক শিরদাঁড়া টান করে দাঁড়িয়ে আছে। মধুরাকে দেখে সে বলল, 'নমস্তে—' বলেই গেট খুলে দিল।

এ বাড়িতে সবাই মধুরাকে বিশ্বাস করে। তা ছাড়া সোমেশ যে তার জন্যই পনের বছর পর নতুন জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে তা আর কারো জানতে বাকী নেই। 'মেরিগোল্ডে'র প্রতিটি মানুষের কাছে দারুণ খাতির।

বাইরে এসে কুড়ি পা'ও সে যেতে পারল না, তার আগেই একটা পুলিশ ভ্যান পাশে এসে দাঁড়াল। একজন পুলিশ অফিসার নিচে নেমে বলল, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট। গাড়িতে উঠুন।'

মুহূর্তের জন্য চারদিকের বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, ভিলে পার্লের স্কাই লাইন গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল যেন। আচ্ছন্নের মতো পুলিশ ভ্যানে উঠতে আবছাভাবে মধুরার চোখে পড়ল আরো অনেকগুলো পুলিশ ভ্যান মেরিগোল্ডের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

মধুরা ওঠামাত্র ভ্যান ছুটতে শুরু করল। তারপর পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে সাউথ বম্বের একটা হাজতে এনে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। এবং তারও ঘণ্টা তিনেক পর আরেকটা ভ্যান তাকে নিয়ে এল পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সে।

একজন সাব-ইনস্পেক্টর রাস্তা দেখিয়ে দেখিয়ে তে-তলায় একটা ঘরের

কাছে এসে বলল, 'ভেতরে যান। ডি-সি অপেক্ষা করছেন।'

ভেতরে পা দিয়েই চমকে উঠল মধুরা। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে পুরো ইউনিফর্ম পরে বসে আছে রোমিও।

রোমিও বা ডি-সি বললেন, 'আসুন আসুন—'

মধুরা টের পাচ্ছিল অদ্ভুত এক কাঁপুনি তার হাড়ের ভেতর থেকে উঠে আসছে। শিথিল গলায় সে বলল, 'রোমিও—মানে আপনি—'

ডি-সি বললেন, 'আপনিও যেমন নকল মধুরা, আমিও তেমনি নকল রোমিও। বসুন মিস কুলকার্ণি—'

আরো একবার চমকে উঠল মধুরা। বলল, 'আপনি আমার নাম জানেন?'

'জানি, জানি সুজাতা কুলকার্ণি। আপনাদের মাহিমের বাড়িও চিনি। আপনার কজন ভাইবোন, সব আমার জানা। ক'দিন আগে আপনার মায়ের জ্বর হয়েছিল না? সেই জন্যেই তো মেরিগোল্ড থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'মিস কুলকার্ণি যে মোমেন্টে আপনি মেরিগোল্ডে প্রথম পা দিয়েছিলেন তারপর থেকে এক সেকেণ্ডের জন্যেও আপনি আমার নজর এড়িয়ে কিছু করতে পারেন নি।'

মধুরা চুপ করে রইল।

ডি-সি বলতে লাগলেন, 'তবে একটা কথা স্বীকার করব, ধীরুভাই আর তার ফ্রেণ্ডদের ভয়েস টেপ করে আপনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। এভাবে হেল্প না করলে ধীরুভাইদের ধরতে আমার অসুবিধা হত।'

মধুরা বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করল, 'ধীরুভাই দেশাই কি ধরা পড়েছেন?'

'শুধু তিনিই নন, দলবলসুদ্ধ গোকুলদাস আমবানিও এখন হাজত বাস করছেন।'

মধুরা কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না।

ডি-সি বলতে লাগলেন, 'মিস কুলকার্ণি, আপনি স্মাগলারদের সঙ্গে নিরু-

পায় হয়ে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। আইন তো কাউকে ছাড়ে না। তবু আমি আপনার জন্যে চেষ্টা করব। আই ফীল ফর ইউ, পুওর লেডি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে গভীর সহানুভূতি।

মধুরা এবারও চুপ করে রইল।

ডি-সি আবার বললেন, 'আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব মিস কুল্‌কার্ণি।'

আবছা গলায় মধুরা বলল, 'কী?'

'প্লীজ, পাশের ঘরে যান। একজন আপনার জন্যে ওয়েট করছেন!'

মধুরা আস্তে আস্তে উঠে ডানদিকের ঘরে ঢুকতেই দেখল সোমেশ বসে আছে। তাকে দেখামাত্র সে উঠে দাঁড়াল, 'এসো এসো—'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মধুরা। সোমেশের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। ঘাড়টা ভেঙে যেন নুয়ে পড়ল। নতচোখে রুদ্ধ গলায় সে বলল, 'কেন এলে এখানে?'

স্নিগ্ধ গলায় সোমেশ বলল, 'তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে কারো আসতে নেই। আমি ঠক, বিশ্বাসঘাতক। তুমি যদি আমার সব কথা জানতে!'

'ডি-সি আমাকে সব বলেছেন সুজাতা। তোমার মায়ের সঙ্গে মাহিমে গিয়ে দেখাও করে এসেছি।' বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এল সোমেশ। মধুরা বা সুজাতার কাঁধে একটা হাত রাখল।

ভাঙা গলায় সুজাতা বলল, 'আমার জীবন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল সোমেশ।'

গভীর মমতায় সোমেশ বলল, 'কিছুই নষ্ট হয় না। ভয় কী, আমি তো তোমার পাশে আছি।'

দুহাতে মুখ ঢাকল সুজাতা। তার চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।